মুজাহিদের
পথ ও পাথেয়

মাওলানা মাসউদ আযহার

মুজাহিদের পথ ও পাথেয়

মূল
মাওলানা মাসউদ আযহার

অনুবাদ
মোল্লা মেহেরবান

মাকতাবাতুল কুরআন
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুজাহিদের পথ ও পাথেয়

মূল ঃ মাওলানা মাসউদ আযহার
অনুবাদ ঃ মোল্লা মেহেরবান

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল কুরআন
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৮৭-৬২৮৬৭৮

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০০৬ ইং

প্রচ্ছদ
রিয়াজ হায়দার

অক্ষর বিন্যাস
আল-আশরাফ কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৬৪৭৪৪৫

মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

হামদ ও সালাতের পর–

হযরত মাওলানা মাসউদ আযহার সাহেব-এর ব্যক্তিত্বকে জিহাদ ও দাওয়াতে জিহাদের ময়দানে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। বক্তৃতা ও লেখালেখি উভয় ক্ষেত্রেই মাওলানা সমানভাবে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন– বৃটেন, আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সংযুক্ত আরব আমীরাত ও ভারত-পাকিস্তানসহ অসংখ্য দেশে মাওলানার জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লেখনি অসংখ্য মুসলিম নওজোয়ানকে শাহাদাতের তামান্নায় জিহাদের রক্ত পিচ্ছিল পথে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার সাহস যুগিয়ে চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ কাশ্মীর, তাজিকিস্তান ও আফগানিস্তানের রণাঙ্গনে অসংখ্য যুবকের উপস্থিতির পিছনে তাঁর রয়েছে বিশেষ ভূমিকা।

আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য যে, আমেরিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের দ্বীপ-উপদ্বীপগুলোতেও মাওলানার ওয়াজের ক্যাসেট শুনতে পাওয়া যায়। খবরে প্রকাশ, ভারতের কেন্দ্রীয় লোকসভায়ও তাঁর ক্যাসেট বাজাতে শোনা গেছে।

বক্তৃতার সাথে সাথে তাঁর লিখিত পুস্তকগুলোও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হওয়ায় সেগুলো অনুবাদ হচ্ছে বিভিন্ন ভাষায়। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর লিখিত 'যাদে মুজাহিদ' নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করে অত্যন্ত যত্নের সাথে বাংলায় অনুবাদ, প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সম্পাদনা করেছেন বিদগ্ধ গ্রন্থকার, গবেষক ও আইনবিদ মোল্লা মেহেরবান।

আল্লাহ তা'আলা উভয়কে উত্তম প্রতিদান দিন। সাথে সাথে বইটি কবুল করে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের উসিলা করুন– আমীন।

বিনীত-

প্রকাশক

মহানবী (সা.)-এর সুসংবাদ

আমার উম্মাতের দুটি দলের জন্য আল্লাহ তা'আলা নাজাতের সিদ্ধান্ত লিখে দিয়েছেন। একটি সেই জামা'আত যা ভারতবর্ষে জিহাদ করবে। আরেকটি সেই জামা'আত যা হযরত ঈসা (আ.) -এর সাথে (তার পুনরায় পৃথিবীতে আসার পর) থাকবে।

-নাসায়ী শরীফ ঃ ২/৬৩

কিছু বলে যাই

একটি ঠেলাগাড়ী এক্সিডেন্ট করলে কী আর ক্ষতি হবে? কিন্তু যদি একটি উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, তাহলে তার যাত্রীদের সমুহ ক্ষতির আশংকার সাথে সাথে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও দাঁড়াতে পারে কোটি টাকায়। ইসলামের সর্বোচ্চ শিকড় নামে স্বীকৃত জিহাদ ও অন্যান্য ইবাদতের বিষয়টিও তেমনি। অর্থাৎ, যে কাজটি করা, যতোটুকু ঝুঁকিপূর্ণ সেটি দুর্ঘটনায় পতিত হলে ক্ষতির পরিমাণও হয় ততো বেশি।

দু'রাকআত নফল নামাযে সর্বোচ্চ ক্ষতি আর কী হতে পারে? বেশির বেশি নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু একটি নফল জিহাদী অভিযানেও কোন প্রকার ভুল তথা শরী'আতের খিলাফ পন্থা অনুসৃত হলে তাতে সংশ্লিষ্টদের দুনিয়াবী-উখরুবী ক্ষতির সীমা দাঁড়াতে পারে ধারণার বাইরে গিয়ে। এজন্য ইসলামের এ মহান ইবাদতটি নিয়ে যাঁরা চলেন, তাঁদেরকে জানতে হবে এর সমুহ হুকুম–আহকাম, জানতে হবে এর নানা দিক; এর শিক্ষা ও দীক্ষা নিতে হবে খুব অধ্যবসায়ের সাথে।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জিহাদী রাহনুমা, বিশিষ্ট আলিমে দীন, সুবক্তা ও সুলেখক মাওলানা মাসউদ আযহার (দা.বা.) সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মুজাহিদীনে কিরামের উদ্দেশ্যে লিখেছেন 'যাদে মুজাহিদ' নামক বক্ষমান এই মূল্যবান গ্রন্থটি। আমরা এর বাংলা সংস্করণ সুধী পাঠক-পাঠিকার হাতে তুলে দিলাম। এর সকল ভালো দিকগুলো লেখকের। আর সকল ভুল-ভ্রান্তি এ অধম অনুবাদকের।

কোন প্রকার সুপরামর্শ, ভ্রান্তি ও দিকনির্দেশনা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই সবার জন্য দু'আ করুন, ভুল-ভ্রান্তি মাফ করুন, মহান তক রব্বে কায়েনাত আপনাদের ও আমাদের সবাইকে মার্জনা করুন– আমীন।

ধন্যবাদ-

তাং ০৫-০৬-০৬ ইং

মোল্লা মেহেরবান

দরবারে নববী (সাঃ) এর সুসংবাদ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত নবী কারীম (সা.)
ইরশাদ করেন, গাজী (আল্লাহ্‌র রাহের সৈনিক) কেবল
জিহাদের সাওয়াব পায় আর যে ব্যক্তি তাঁকে
প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করে জিহাদের
সামর্থবান করে তোলে সে সাহায্য
করার প্রতিদান পায় এবং
গাজীর (জিহাদের)
সাওয়াবও
পায়।

নিবেদন ইতি

এই নিবেদনটি আপনাদেরই একভাই আপনাদের জন্য লিখেছে। আপনারা নিবেদনটি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আদ্যোপান্ত পড়বেন। যদি এতে কোন ভালো কথা থাকে, তাহলে তার উপর নিজে আমল করবেন, সাথে সাথে অন্য দীনী ভাই পর্যন্তও কথাগুলো পৌঁছাবেন।

মনে রাখবেন, উম্মাতে মুসলিমার দৃষ্টিসমূহ আপনাদের দিকে নিবদ্ধ, মজলুম জায়া-কন্যা-জননীরা আপনাদের প্রতীক্ষায় এক একটি মুহূর্ত অতিক্রম করছে। জিন্দানখানার আহাদ, আহাদ আর্তি আপনাদেরকে চিৎকার দিয়ে আহ্বান করছে। প্রত্যেক মসজিদ ও খানকা সমূহে দু'আ করা হচ্ছে আপনাদের জন্যে। আপনারা নির্ভয়ে, অবিচল-চিত্তে জিহাদ চালিয়ে যান।

আপনাদের অস্তিত্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর বিরাট নিয়ামত, আপনাদের জিন্দেগী সর্বস্ব সৌভাগ্য, আপনাদের মৃত্যু শাহাদাত। কিন্তু আল্লাহর দুশমনরা আপনাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, রাতদিন একাকার করে বুনছে নানা রকম চক্রান্তের জাল, আপনাদের অস্তিত্ব কাফির গোষ্ঠীর জন্য রীতিমতো পীড়াদায়ক। সকল কুফরী শক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে নির্মূল করা। তাই তা-দমে হায়াত লড়ে যেতে হবে আপনাদেরকে এই শহীদী পথে।

জাতিসংঘ, কোন মানবাধিকার সংগঠন, কোন অর্থনৈতিক সংগঠন কিংবা কোন সামরিক জোট; যে কেউ হোক না কেন, সবাই আপনাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক সংকট ও সমস্যা হিসাবে পেশ করছে, ইসলামের শত্রুরা ইসলামী বেশভুষা ধারণ করে ইসলামের হামদর্দী প্রকাশ করছে। মুনাফিকরা মুসলমান নাম ধারণ করে আপনাদের কাতারে ঢুকে পড়ছে। কিন্তু আপনাদের মাথায় শিরস্ত্রাণ বেঁধে সকল চক্রান্ত রুখে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইনশাআল্লাহ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ আপনাদের সহায় হবেন। তবে আপনাদেরকে গ্রহণ করতে হবে কিছু প্রশিক্ষণ ও পদ্ধতি। জি হ্যাঁ! এসব বিষয়ই আলোচনা করা হয়েছে বক্ষমান গ্রন্থটিতে।

আপনাদের ভাই

মাসউদ আযহার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

লেখকের ভূমিকা

আনুমানিক এক বছর পর্যন্ত বিভিন্ন টর্চার সেন্টারে থাকার পর যখন আমাকে জেলে প্রেরণ করা হলো, তখন জেলখানা ভালোই লাগলো। কেননা এখানে চিৎকার, আহাজারি ও করুণ আর্তনাদ নেই, নেই লজ্জাজনক ও বেহায়াপূর্ণ কোন দৃশ্য, যা টর্চার সেন্টারের নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় ছিলো।

জেলখানায় আমাকে খুব গুরুত্ব দেয়া হলো। অর্থাৎ, এমন ওয়ার্ডে আমাকে নিয়ে রাখা হলো, যেখানে বড় বড় দাগী অপরাধীকে রাখা হয়। মূলত এটি জেলখানার জেল, যেখানে কোন অবাধ্য কয়েদীকে একেবারে অপারগতার সময় সর্বোচ্চ একমাস রাখা হয়। কিন্তু আমাকে প্রথমেই এখানে রাখা হলো।

এরপরও আমি এটাকে কঠিন রোদের সময় বৃক্ষের শীতল ছায়ার ন্যায় মনে করলাম। কারণ এর পূর্বে যেখানে রাখা হয়েছিলো, সেখানে কাক ডাকা ভোরে জোরপূর্বক ঘুম থেকে উঠিয়ে হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি খুলে দিয়ে বন্দুকের নলের সামনে রেখে পেটাতে পেটাতে ও অশ্লীল গালিগালাজ করতে করতে ইস্তিঞ্জাখানায় নিয়ে যাওয়া হতো। যেহেতু চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র একবারই ইস্তিঞ্জা করার সুযোগ দেয়া হতো, তাই শত কষ্ট ও গালিগালাজের মধ্যেও লেংড়াতে লেংড়াতে মুশকিল ও জরুরী এ কাজটি থেকে ফারিগ হতো সবাই।

সকাল নয়টার পরই পুরো টর্চার সেন্টার চিৎকার ও আহাজারিতে কেঁপে উঠতো। শুরু হতো বিভিন্ন রকম জিজ্ঞাসার পালা। কেউ উল্টাভাবে লটকানো অবস্থায় কুরআনের আয়াত পড়ছে ও আহাজারি করছে, কেউ বৈদ্যুতিক শকের দরুন আল্লাহ আল্লাহ চিৎকার করছে, কারো পা ধরে হেঁচড়ানো হচ্ছে, আবার কাউকে একেবারে বিবস্ত্র করে মারা হচ্ছে চাবুক। কারো উপড়ানো হচ্ছে এক একটি করে দাড়ি, আবার কাউকে নির্মমভাবে পদদলিত করে বাধ্য করা হচ্ছে মদ পান করতে। আহা! সে এক করুণ দৃশ্য।

অধিকাংশ কয়েদিকে উলঙ্গ করে জোরপূর্বক একজনের লজ্জাস্থানকে অন্যের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হতো, কোথায় তোমাদের মদদগার? দেখেছো, এই হলো তোমাদের স্বাধীনতা! কেউ পাগলের মতো চিৎকার করছে তার গায়ে পেট্রোলের ইনজেকশন দেয়ার দরুন, আবার কাউকে দু'হাত বেঁধে ফেলে রেখে খেতে দেয়া হচ্ছে নাপাকি মিশ্রিত খাবার।

সেখানে তাদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিলো একজন মুজাহিদকে বিবস্ত্র করে তাকে নিয়ে খেলা করা, স্থানে অস্থানে মারপিট করা। এ সময় তারা বলতো– এখন জিহাদ করো। গালি দাও তোমার মাকে, শ্লোগান দাও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, শ্লোগান দাও জিহাদের বিরুদ্ধে।

যে মুজাহিদ ঘর থেকে বের হয়েছে নিজেদের মায়ের ইজ্জতের হিফাজতের জন্য, বের হয়েছে জিহাদকে জিন্দা করার জন্য, সে কস্মিম কালেও তাদের কথা মানতে পারে না। অনুসরণ করতে পারে না তাদের কমান্ডের। সুতরাং তারা তাদের জুলুম আরো বাড়িয়ে দিতো, চাবুক মারতো সজোরে, পেশাব করে দিত কারো মুখে। আবার কারো উপর অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতো নানা রকম জুলুম-নির্যাতন।

আহ! সে এক আজব জায়গা ছিলো। জি হ্যাঁ! টর্চার সেন্টারগুলোতে এমনি হাজারো শেরে খোদার উপর চালানো হচ্ছে বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিবিধ জুলুম-নির্যাতন। তারা মনে করছে, এভাবে ইসলাম মিটে যাবে, থেমে যাবে এসব দেওয়ানা। অথচ এই অগ্নিকুণ্ডগুলো এমন, যাতে একবার যাকে জ্বালানো হয়, সে খাঁটি সোনা হয়ে বের হয়। এখানে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়, কিন্তু মজবুত হয় ঈমান। এখানে দুশমন আসল চেহারায় আবির্ভূত হয়, কিন্তু শক্তিশালী হয় মুমিনের হৃদয়। এখানে শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, কিন্তু মজবুত হয় আদর্শ; বুলন্দ হয় হিম্মত।

এটা সেই তরবিয়ত খানা, যেখানে সাইয়িদিনা বিলাল (রা.) ও সাইয়িদিনা খাব্বাব (রা.) খাঁটি সোনা হয়ে বের হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই এখানে গোশ্ত পোড়ার গন্ধ আসে, কিন্তু হৃদয়বানরা হৃষ্ট-পুষ্ট ফুলের সুবাসের ন্যায় ঈমানের খুশবু অনুভব করেন। আমি এখানে ঈমান ও কুফরের সেই বাস্তবতাকে স্বচক্ষে দেখেছি, যা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। কুফরের বাস্তবতা

এবং ঈমানের বাস্তব নমুনা দেখেছি। জেলখানায় ঈমানদারীর এই দৃশ্য দেখেছি যে, যখন কোন ভাইয়ের উপর জুলুম-নির্যাতন চলতো, তখন অন্য বন্দী ভাইয়েরা নিজ নিজ সেলে সিজদায় পড়ে মজলুম ভাইয়ের জন্য অশ্রু বহাতে থাকতো। মনে হতো মজলুম ভাইয়ের চাইতে অন্যারাই দুঃখিত হতো বেশি। একবার আমার উপর বিশেষ ধরনের টর্চারিং করা হলো। এতে ভাইয়েরা মুখে চাদর পেচিয়ে ডুকরে কাঁদতে লাগলো। কাফিরদের নির্যাতনে আমি এক ফোঁটা চোখের পানিও ফেলিনি। কিন্তু ভাইদের হামদর্দী দেখে তাদের সাথে আমিও ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলাম। এ সময় এজন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেছি যে, কাফিরদের জুলুমের দরুন নয়, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দরুন অশ্রু ঝরেছে।

সেখানে কেউ কারো খিদমত করা কিংবা কাউকে সম্মানের সাথে ডাকা নিষেধ ছিলো। কিন্তু কতো সাথী যে অপরকে ইজ্জতের সাথে ডাকার দরুন মার খেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আমি সেসব ঈমানী দৃশ্য কিভাবে ভুলতে পারি যে, যখন আমরা রাতে শুইতে যেতাম, তখন কোন সাথী কোন মলম কিংবা ব্যথা উপশমের কোন ওষুধ সংগ্রহ করতে পারলে তা কম্বলের নীচে লুকিয়ে ততোদূর চলে আসতো, যতোদূর পর্যন্ত তার শিকল যেতো। এরপর অপর সাথীর জখমীতে তা মালিশ করতো।

মোটকথা, এ ধরনের মানবেতর অবস্থায় ঈমানী শক্তি যতোটুকু হৃষ্ট-পুষ্ট হতে দেখেছি, অন্য কোথাও তা দেখিনি। সেটি আমার জীবনের মূল্যবান সময়। সে সব মুহূর্ত আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। মজবুত করেছে আমার আদর্শকে।

এ ধরনের জুলুম-নির্যাতনের পর যখন জেলখানায় আসলাম, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই একটু আরাম অনুভব করলাম। কিন্তু তারা জেল কর্তৃপক্ষকে খুবই ভয় দেখিয়েছিলো। এ জন্য তারা আমার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতো এবং কঠোরতা করতো। তারপরও যখন একটু আরাম মিললো, কাগজ-কলম হাতের কাছে পেয়ে গেলাম। তখন অবশিষ্ট কাজগুলো শেষ করার ইচ্ছায় উদগ্রীব হয়ে উঠলাম।

অনেক কিছু মনে জমা করে রেখেছিলাম, যা উম্মাহ পর্যন্ত পৌছানোর ইচ্ছা ছিলো। আর অনেক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, যার কারগুজারী উম্মাহকে শুনানো জরুরী মনে হয়েছিলো। সুতরাং সময় সুযোগ বুঝে লেখা শুরু করলাম। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রায় দু'শ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ কাগজে লিখে ফেললাম। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা ঘোলাটে হয়ে গেলো এবং সেই লেখাটি হয়ে গেলো হাতছাড়া। ভয় করতে লাগলাম, না জানি লেখাটি বন্ধুদের হাতে পৌছার আগেই শত্রুদের হাতে পৌছে যায় কিনা! আর মনে মনে আফসোস হতে লাগলো যে, আমার গুনাহ ও গাফলতের দরুনই বুঝি দীনের কাজ থেকে ছুটির মেয়াদ এখনো শেষ হলো না।

এ ঘটনার তিন মাস পর পরিস্থিতি বেশ ভালো হলো। তার সাথে বিভিন্ন অবস্থা দেখে ও পড়ে মনে হলো, উম্মাতের বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীলদের বিবেককে চাঙ্গা ও উম্মাহর হৃত মান-ইজ্জত পুনর্বহাল করার প্রচেষ্টাস্বরূপ যে কাজ শুরু করার দরকার ছিলো, ইতোমধ্যে সে কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। উম্মাহ যে দলটির অন্বেষায় পাগল প্রায় হয়ে পড়েছিলো, খোদার শোকর! আজ সে দলের সৃষ্টি হয়ে গেছে। মুজাহিদীনে কিরামের সেই শ্রেণী আজ বিন্যস্তভাবে ও সুসংগঠিত হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সারা পৃথিবীর কুটিল শ্রেণী জিহাদ ও মুজাহিদীনে কিরামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে, তার বিপরীত কর্মপদ্ধতি এখনো চালু হয়নি বললেই চলে। এখন প্রয়োজন সেটিই। আমি মুজাহিদীনে কিরামের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের মুজাহিদীনে কিরামের দৃষ্টি সেদিকেই আকৃষ্ট করতে চাই।

কাল পর্যন্ত সকলের হৃদয়ে এই তামান্না ও আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার এবং ইসলামের মান ও ইজ্জত পুন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ময়দানে এমন এক কাফেলা ঝাঁপিয়ে পড়ুক, যারা হবে "বাঁচলে গাজী মরলে শহীদ"- এর চেতনায় উজ্জীবিত; জীবনের চেয়ে যাদের কাছে মৃত্যুই হবে বেশি প্রিয়, যারা কাফিরদের মানসিক ও দৈহিক গোলামী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং যারা হবে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ঝাণ্ডাবাহী। কেননা ইসলামের হিফাজতের জন্য একদল জানবাজ মুজাহিদের খুবই প্রয়োজন। আর এখন সবার এই চিন্তা ও ফিকির সৃষ্টি হয়েছে যে, কিভাবে জিহাদ ও মুজাহিদীনে

কিরামের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়! অবশ্যই এমন একটি ব্যবস্থা নেয়া হোক, যার মাধ্যমে এই মহান নিয়ামত -এর পূর্ণ হিফাজত করা যায়, যা শতাব্দিব্যাপী অপেক্ষার পর বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। যে কোন মূল্যে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী এই জানবাজ সন্তানদেরকে সব রকমের ফিতনা-ফাসাদ ও চক্রান্তের বেড়াজাল থেকে মুক্ত রেখে এগিয়ে নিতে হবে মনযিলে মাকসুদে।

এই চিন্তা ও চেতনা হৃদয়ের মাঝে এমন প্রবল আকার ধারণ করলো যে, তাৎক্ষণিকভাবে মুজাহিদ ভাইদেরকে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি লেখার ইচ্ছা পোষণ করলাম এবং দ্রুত কয়েক পৃষ্ঠা লিখেও ফেললাম। এরপর তা মুজাহিদীনে কিরামের সমস্যাবলী, সংকট ও সেসব বিপদাপদ সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যা তাদের চতুর্পার্শ্বে টর্ণেডোর ন্যায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। ইতোমধ্যে আবার ঘোলাটে হয়ে গেলো পরিস্থিতি। চিঠিটা একটু বড়ই হয়ে গিয়েছিলো। সেটাকে একটি ছোট্ট পুস্তিকাই বলা চলে। এহেন পরিস্থিতিতে লিখাটি আবার হারিয়ে যাওয়ার ভয় হলো। কিন্তু না! যথাসময়ে তা লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে নিলাম।

আনুমানিক দেড় দু'মাস লেখাটি লুকিয়ে রাখাটা যেন একটি ছোট্ট অভিযান। আল্লাহর ফজলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে লেখাটি লুকিয়ে রাখার সময় ঘটনাক্রমে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর লিখিত 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো' বইটি হাতে আসলো। সেটি পড়লাম অত্যন্ত মনোযোগের সাথে। এই বই আমার চিন্তা ও চেতনাকে আরো শানিত করে তুললো। বরং বলতে হবে, আমার মনে এতোদিন যেসব কথা ঘুরপাক খাচ্ছিলো, যেন সেগুলোই হুবহু লিখা হয়েছে এখানে।

এরপর যখন পরিস্থিতি আবার শান্ত হলো, তখন লুকিয়ে সে লেখাগুলো বের করে গুছিয়ে নিলাম, শেষ করলাম বাকী অংশটুকু। এবার এ লেখায় অনেক বিষয় উল্লেখিত বই থেকে সংযোজন করলাম। এতে বইটি আরো প্রাঞ্জল হয়ে উঠলো। এখন সমস্যা দাঁড়ালো বইটি পাঠানোর। কিভাবে বইটি আমার কাঙ্ক্ষিত ভাইদের কাছে পৌছানো যায় অবশেষে আল্লাহর বিশেষ

অনুগ্রহে পাণ্ডুলিপিটি হযরতে আকদাস......... এর হাতে পৌঁছানোর সৌভাগ্য হলো। জিহাদ ও মুজাহিদীনে কিরামের সাথে হযরতের হৃদ্যতা ও উম্মাতে মুসলিমার জন্য আন্তরিকতা ছিলো অপরিসীম। অসংখ্য ইলমী ব্যস্ততার পরও রাতদিনের আরাম-আয়েশ কুরবান করে উম্মাহর জন্য তিনি যে পরিশ্রম করেছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বলতে হবে, উম্মাত তার সৌভাগ্যের দরুন এমন মুত্তাকী-পরহেজগার, মুখলিস, মেহনতি ও জানবাজ আলিম নেতৃত্ব পেয়েছিলো।

এই ছিলো এ লেখা তৈরি ও প্রেরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এরপর কি হবে? আদৌ কি লেখাটি ছাপা হবে কিনা জানি না। তবে আমি এ আমানত এক মহান মুরব্বীর কাছে প্রেরণ করে চিত্তে প্রশান্তি লাভ করতে পেরেছি। সাথে এক চিঠিতে আমি তাঁর কাছে আমার অজ্ঞতার কথা স্বীকার করে এই দরখাস্ত করেছি যে, 'এই লেখার ব্যাপারে আপনি যা ভালো মনে করেন, তাই করবেন। যদি আপনার মনে হয় যে, লেখাটি ছাপলে উম্মাতের ফায়দা হবে, তাহলে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে তা ছাপার ব্যবস্থা করবেন। আর যদি মনে হয় লেখাটি মানোত্তীর্ণ নয় কিংবা তার প্রয়োজন নেই, তাহলে তা ব্যবহৃত কাগজ রাখার ঝুড়িতে ফেলে দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করবেন না।'

এই নিবেদনটি যদি ছাপা হয়ে যায়, তাহলে মুজাহিদীনে কিরামকে (চাই তারা যে কোন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত, চাই যে কোন রণাঙ্গনে রয়েছেন) বিনীতভাবে বলতে চাই যে–

এই নিবেদনটি আপনাদেরই একভাই আপনাদের জন্য লিখেছে। আপনারা নিবেদনটি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আদ্যোপান্ত পড়বেন। যদি সাথে সাথে অন্য দীনী ভাই পর্যন্ত ও কথাগুলো পৌঁছাবেন। মনে রাখবেন, উম্মাতে মুসলিমার দৃষ্টি সমূহ আপনাদের দিকে নিবদ্ধ, মজলুম জায়া-কন্যা-জননীরা আপনাদের প্রতীক্ষায় এক একটি মুহূর্ত অতিক্রম করছে। জিন্দানখানার আহাদ আহাদ আর্তি আপনাদেরকে চিৎকার দিয়ে আহ্বান করছে। প্রত্যেকটি মসজিদে ও খানকাসমূহে দু'আ করা হচ্ছে আপনাদের জন্যে। আপনারা নির্ভয়ে, অবিচল চিত্তে জিহাদ চালিয়ে যান।

আপনাদের অস্তিত্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর বিরাট নিয়ামত, আপনাদের জিন্দেগী সর্বস্ব সৌভাগ্য, আপনাদের মৃত্যু শাহাদাত। কিন্তু আল্লাহর দুশমনরা আপনাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, রাতদিন একাকার করে বুনছে নানা রকম চক্রান্তের জাল, আপনাদের অস্তিত্ব কাফির গোষ্ঠীর জন্য রীতিমতো পীড়াদায়ক। সকল কুফরী শক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে নির্মূল করা। তাই 'তা-দমে' লড়ে যেতে হবে আপনাদেরকে এই শহীদী পথে।

জাতিসংঘ, কোন মানবাধিকার সংগঠন, কোন অর্থনৈতিক সংগঠন কিংবা কোন সামরিক জোট যে কেউ হোক না কেন, সবাই আপনাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক সংকট ও সমস্যা হিসাবে পেশ করছে, ইসলামের শত্রুরা ইসলামী বেশভূষা ধারণ করে ইসলামের হামদর্দী প্রকাশ করছে, মুনাফিকরা মুসলমান নাম ধারণ করে আপনাদের কাতারে ঢুকে পড়ছে। কিন্তু আপনাদেরকে মাথায় শিরস্ত্রাণ বেঁধে সকল চক্রান্ত রুখে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইনশাআল্লাহ মহাপরাক্রা মশালী আল্লাহ আপনাদের সহায় হবেন। তবে আপনাদেরকে গ্রহণ করতে হবে কিছু প্রশিক্ষণ ও পদ্ধতি। জি-হ্যাঁ! এসব বিষয়ই আলোচনা করা হয়েছে বক্ষমান বইটিতে।

–আপনাদের ভাই

মাসউদ আযহার

সূচীপত্র

—২

বিষয়	পৃষ্ঠা
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৭৪
দরবারে নববী (সাঃ) এর সুসংবাদ	৭৮
জিহাদের অর্থনৈতিক শাখা	৭৯
অর্থনৈতিক শাখার বুনিয়াদি	৮০
এ তিনটি বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৮১
অর্থনৈতিক শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব	৮২
অর্থনৈতিক শাখার আরেকটি দায়িত্ব	৮৪
জিহাদের সামরিক শাখা	৮৬
সামরিক শাখা	৮৭
সামরিক প্রশিক্ষণ	৮৮
উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ	৮৮
খালেস মানসিক তারবিয়াত	৮৮
শারীরিক ও অস্ত্রপাতির প্রশিক্ষণ	৮৯
আনুগত্য	৮৯
কৌশল	৯০
সামরিক শাখার বিভাগসমূহ	৯৩
জিহাদ ও সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য	৯৪
জিহাদের সম্ভাব্য পরিণতির জন্য মানসিক প্রস্তুতি	১০০
মুজাহিদীনের গুণাবলী পূর্ণাঙ্গ ঈমান	১০৩
ইত্তিবায়ে সুন্নাত	১০৯
যিকির ও নফল	১১১
হক্কানী পীরের হাত ধরুন	১২০
পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখুন	১২০
আমীরের আনুগত্য	১২৫
মুজাহিদের আয়না	১২৬

جہادی تحریکوں کے لیے

دستور العمل

জিহাদী সংগঠনের

সংবিধান ও কর্মপদ্ধতি

জিহাদী সংগঠন সমূহের কর্মপদ্ধতি করুণ বাস্তবতা

এ সময়ের করুণ বাস্তবতা হলো যে, আজ ইসলামের দুশমনদের কাছে মুসলমানদের অস্তিত্ব ও ইসলামের নামটি পর্যন্ত অসহনীয়। ওদের কাছে যেন মুসলিম নামটিও বেমানান। মুসলমানদের হাতে অতীতে তাদের বাপ-দাদাদের করুণ পরাজয়ের কথা তারা ভুলেনি। সেই লাঞ্ছনাকর ইতিহাসের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য তারা যেমন খুব সতর্ক, তেমনি সদা আতংকিত।

ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে মুসলমানদের থেকে তারা ছিনিয়ে নিয়েছে খিলাফত, স্বাধীনতা, একতা ও জিহাদকে। চাপিয়ে দিয়েছে তাদের উপর সাম্প্রদায়িকতা, নিছক দেশপ্রেমসহ নানা রকম ইসলাম অসমর্থিত বিষয়। সাথে সাথে তাদের উপর চালিয়েছে বিভিন্নভাবে আগ্রাসন, যাতে মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করা সহজ হয়।

চক্রান্তের এই ধারাবাহিকতায় তারা ইসলামী দেশসমূহের ক্ষমতায় তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদেরকে বসিয়েছে পরিকল্পিতভাবে, যাতে এসব বিধর্মীয় সেবাদাস, স্বার্থান্বেষী ও আরামপ্রিয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা সহজ হয়। সব মিলিয়ে ময়দান তাদের অনুকুল ছিলো। হঠাৎ আফগানিস্তানের জিহাদ শুরু হওয়ায় তাদের আশায় পানি পড়ে গেছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা এই প্রতিরোধ আন্দোলন ঠেকাতে। কিন্তু না! আফগানিস্তানের এই জিহাদ মুসলিম উম্মাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে হাজার বছরের পুরানো সেই ভুলে যাওয়া সবক। তাই দিকে দিকে পুন জ্বলে উঠেছে দীন-ইসলামের লাল মশাল। মাথায় কাফন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে মুসলিম নওজোয়ানরা তাদের মজলুম মা-বোনদের পাশে। আজকে তারা মুকাবিলা করতে চায় বর্তমানের এই করুণ বাস্তবতাকে। রুখে দিতে চায় সকল ধরনের চক্রান্তকে। তালিবান, আল-কায়িদা, হামাস, ইসলামী জিহাদ ইত্যাদি সংগঠন উল্লেখিত জানবাজ মুসলিম জোয়ানদের বিভিন্ন কাফেলার নাম। উম্মাহর প্রত্যেকটি সদস্যের কাছে বিনীত অনুরোধ অন্তত আপনারা এদেরকে সন্ত্রাসী বলবেন না। ওরা সন্ত্রাসী নয়; ওরা আপনাদের বন্ধু- ওরা আল্লাহওয়ালা। ওরা উদ্ধার করতে চায়, নিজের রক্তের বিনিময়ে হলেও সেই সোনালী অতীতকে। নাসরুম মিনাল্লা-হি ওফাত্হুন কারীব।

সমকালীন জিহাদী সংগঠনগুলো সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

সমকালীন কিংবা কিছুদিন পূর্বেকার জিহাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি মিল রয়েছে যে, এ সমস্ত সংগঠন কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী হাতে নিয়ে শুরু হয়নি। বরং সবগুলোই একটি বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এরপর তারা আস্তে আস্তে গুছিয়ে তাজিকিস্তান, জিহাদে বলকান (বসনিয়া) -এর কোনটিই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য পরিকল্পিতভাবে শুরু হয়নি। এসবের কোনটির জন্যই প্রাথমিকভাবে ছিলো না কোন ট্রেনিং এবং ছিলো না কোন সংগঠন।

আফগানিস্তানের ইসলামী জনতাকে কমিউনিজমের ধাবমান সয়লাব থেকে বাঁচানোর জন্য কয়েকজন আল্লাহওয়ালা আফগান নেতা বিচ্ছিন্নভাবে জিহাদী নিশানকে উঁচু করেন। সহায়-সম্বলহীন এই আন্দোলন দেখতে দেখতে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী সংগ্রামে রূপ নিলো।

কাশ্মীরের রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে কার্য সিদ্ধি না হতে দেখে গুটি কয়েক জানবাজ তরুণ ক্ষমতাসীন শক্তির বিরুদ্ধে ছোট ছোট অস্ত্র উঁচু করে ধরলো। অল্প দিনের মধ্যে এই সশস্ত্র আন্দোলন জম্মু-কাশ্মীরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ছড়িয়ে পড়লো, রূপ নিলো একটি শক্তিশালী সংগ্রামে। ছয় লাখ ভারতীয় সেনা, অসংখ্য সিকিউরিটি ফোর্স এবং রাষ্ট্রীয় রাইফেল্‌স -এর অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্য এই আন্দোলন ঠেকাতে রীতিমত ব্যর্থ হয়েছে।

তাজিকিস্তানের সরকার সেখানকার শান্তিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করতে চাইলে স্থানীয় উলামা-মাশায়িখ জিহাদের আযান বুলন্দ করেন, চ্যালেঞ্জ করেন লেনিন ও স্টালিনের আদর্শ অনুসৃত নাপাক নেতৃত্বকে, গ্রহণ করেন কিতাল ও হিজরতের পথকে। এতে এক পর্যায়ে গড়ে ওঠে এক অপ্রতিরুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন।

ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা একমাত্র মুসলিম দেশ বসনিয়া। ওদের কোন অপরাধ ছিলো না। এই নিরপরাধ ও নিরীহ মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর

নজর পড়লো কৃষ্ণ হৃদয় খৃষ্টানদের। সুপরিকল্পিতভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু করে দিলো ক্রুসেড, চালালো নির্মম হত্যাযজ্ঞ। অসংখ্য বছর ধরে মানসিক গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ বসনীয় মুসলমানরা জিহাদী ঝাণ্ডা উঁচু করলো। এভাবেই শুরু হলো উল্লেখিত জিহাদী সংগঠন।

জিহাদী সংগঠনগুলো অগোছালো হওয়ার কারণ

জিহাদী সংগঠনসমূহ অগোছালো হওয়ার কারণ স্পষ্ট। এরপরও কয়েকটি কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলো। যথা-

১. সারা পৃথিবীতে এ সময় এমন কোন ইসলামী রাষ্ট্র নেই যে, সুশৃঙ্খলভাবে জিহাদের ফরযিয়াত আদায়ের ব্যবস্থা করবে। এমতাবস্থায় বিভিন্ন ছোট-বড় সংগঠন এই জিহাদী কার্যক্রম ভিন্ন ভিন্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছে বলেই জিহাদী সংগঠনগুলো অগোছালো।

২. কোন মুসলমান দেশে এমন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাও নেই যে, সারা বিশ্বের মুসলমানদের সাথে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখে কিংবা তাদের আভ্যন্তরীণ ও পারস্পারিক তথা সার্বিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম। কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তি রয়েছে। তবে সে সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, আজ্ঞাবহ ও সীমাবদ্ধতার শিকার। এ শক্তিশালী সেনা বাহিনী নিজেদের নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কিংবা বেশির বেশি প্রতিবেশী দেশের সাথে সংযুক্ত সীমান্তের হেফাজতের ব্যাপারে আদিষ্ট।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থিত লাখো মুসলমান সেনা ইসলাম ও মুসলমানদের সাধারণ নিরাপত্তার জন্য না নিজ রাষ্ট্রের বাইরে উঁকি দিতে পারে, না একটি গুলি চালাতে পারে। অথচ মার্কিন সৈন্য আমেরিকার স্বার্থের জন্য জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যেতে পারে এবং যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। পক্ষান্তরে মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দ নিজেদের ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকসহ সকল বিষয়ে বড় কুফরী শক্তির জুতা উঠানোকে নিজের উপর জরুরী মনে করেন। আর মজলুম মুসলমানদের হিফাজতের ব্যাপারে কথা বলা তো দূরে থাক, মৌখিকভাবে কিছু বলতেও সক্ষম নন।

যদি পাকিস্তানে একজন পাকিস্তানী খৃষ্টান নাগরিক রাষ্ট্রীয় কানুন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধে সাজা পায়, তাহলে আমেরিকা, ইউরোপসহ সারা খৃষ্টান বিশ্ব পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং সেই খৃষ্টানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। অথচ আমেরিকা ও ভারতের জেলসমূহে মুসলমানদের নাম করা নেতা, বড় আলিম কিংবা কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বিনা অপরাধে জুলুমের শিকার হয়, তাহলে কোন ইসলামী রাষ্ট্র তার পক্ষে কথা বলা তো দূরের কথা, টু শব্দটুকুও করে না। এমতাবস্থায় কিছু ইসলামী জিহাদী সংগঠন এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাতে অগোছালো কোন কিছু নজরে পড়া স্বাভাবিক।

৩. বর্তমানের জিহাদী সংগঠনগুলো অগোছালো হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী এমন কোন সুশৃঙ্খল, সার্বভৌম ও পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদের অধিকারী কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন সৃষ্টি হয়নি, যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিহাদের সার্বিক ট্রেনিং দিতে পারে এবং তার কাছে এতোটুকু সরঞ্জামাদি নেই যে, সে যা খুশি তা করতে পারে, যখন যেখানে ইচ্ছা মুসলমানদের শত্রুদেরকে দমন করতে পারে এবং মুসলমানদের সাহায্যার্থে মুজাহিদ পাঠাতে পারে। এ কাজটি বিভিন্ন সংগঠন করছে বলেই নানা রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

উল্লেখিত তিনটি কারণের সাথে আরেকটি কারণ হলো, মুসলমানদের মেজাজ আজ এমন হয়েছে যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর কোন মুসীবত তথা আগ্রাসন না আসে, ততোক্ষণ তারা কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে এমন ব্যক্তিত্ব দুষ্প্রাপ্য ছিলো, যিনি মানসিক ও দৈহিক উভয় দিক থেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত। অথচ মুসলমানদের শত্রুরা দিন রাত একাকার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সর্বক্ষেত্রে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে চলছে, মুসলমানদেরকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সকল কুফর শক্তিগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

জিহাদী সংগঠনগুলোর ব্যাপারে কিছু মুসলমানের খারাপ ধারণা

এখন যেহেতু ইসলামী খিলাফতের নিয়ামত নেই, নেই ইসলামী ধ্যান-ধারণার সরকার, নেই আন্তর্জাতিক এমন কোন সংগঠন যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদীনে কিরামকে বিশ্বের আনাচে-কানাচে নির্যাতিত মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায় এবং না খোদ মুসলমান প্রথম থেকেই মানসিক ও দৈহিকভাবে জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকে, এজন্য যখনই কোন এলাকার মুসলমানদের অস্ত্র হাতে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না, তখন মুসলমানদের মধ্যে ঈমানী জযবা উথলে ওঠে এবং পরাধীন জীবনের উপর তারা ইজ্জত ও শাহাদাতের মৃত্যুকে অগ্রাধিকার ভাবে, তারা বন্ধুহীন ও নিঃসঙ্গ থাকে; কোন স্থান থেকেই তাদেরকে জনবল কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা দিয়ে এগিয়ে নেয়া হয় না। তাদের হাতে যা থাকে তা দিয়েই তারা শত্রুর মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা মুতাবিক তাদের সহায়তা করেন এবং প্রত্যেক ময়দানেই আজব আজব সহায়তার ঘটনা সেই নিরস্ত্র মুজাহিদদের ব্যাপারে প্রকাশ পায়। তারপর আস্তে আস্তে আসতে থাকে বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য ও সহায়তা।

এক্ষেত্রে সমস্যা হলো, তাদের মজবুত কোন সামরিক প্রশিক্ষণ না থাকায় কখনো অপারেশন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়। আবার কখনো মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পায়, যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে কার্যকর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রয়োজনীয় আসবাব না থাকায় তারা বিভিন্ন প্রকার প্রোপাগান্ডার সময়োচিত জবাব দিতে সক্ষম হয় না। এমনিভাবে তারা সুশৃঙ্খল না থাকায় নিজেদের পরিচিতি, কর্মসূচী, অবদান ও কর্মকাণ্ড যথা সময়ে প্রচার করতে পারে না।

উল্লেখিত সমস্যাসমূহ ছাড়াও আরো নানাবিধ কারনে মুসলমানদের এমন নেতৃবৃন্দ যারা পূর্বে থেকেই জিহাদী কার্যক্রমকে আড় চোখে দেখতেন, তারা মুজাহিদীনে কিরামের উপর খারাপ ধারণা পোষণ করতঃ তাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন। এতে কাফির গোষ্ঠী উপকৃত হয় এবং সাধারণ মুসলমানরাও এ সমালোচনার দরুন মুজাহিদদের ব্যাপারে চরম বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

অপরদিকে অপারেশন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় স্থানীয় মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়েন এবং মুক্তির বিকল্প পথ খুঁজতে মরিয়া হয়ে উঠেন। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুফরী শক্তি ও তাদের দোসরদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াগুলো মেতে ওঠে শক্তিশালী মিডিয়া সন্ত্রাসে। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চালাতে থাকে তারা একেবারে ডাহা মিথ্যা তথ্যসন্ত্রাস। এভাবে বর্তমান বিশ্বের জিহাদী সংগঠনগুলোর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর বিরাট একটি অংশ খারাপ ধারণা পোষণে পতিত হন।

বর্তমান অবস্থায় দীনী রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব

এই হলো বাস্তব চিত্র ও বাস্তবতা তবে। এখন আর জিহাদের ট্রেনিং গ্রহনের বিষয়টি মুসলমানদেরও কাছে এমন অপরিচিত নয়, আজ থেকে পনের বছর আগে যেমনটি ছিলো। এখন মুসলমানদের সুবর্ণ সুযোগ এসেছে যে, তারা বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা থেকে সুযোগ এসেছে যে তারা বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা থেকে সুযোগ গ্রহণ করে সেই অশনি বিপদ মুকাবিলায় পূর্ণ জিহাদী প্রস্তুতি নিতে পারে যে বিপদটি তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। এখন তারা হতে পারে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত; সার্বিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে সবল ধরনের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্য।

এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত মুসলমানদের দীনী রাজনৈতিক দলগুলোর। তাদের নিজেদের রাজনৈতিক ইশতেহার, কর্মসূচী ও পরিকল্পনার অবিচ্ছদ্য অংশ হওয়া চাই এই জিহাদী প্রস্তুতির প্রোগ্রাম। এতে করে তৃণমূল পর্যায় থেকে সুপ্রিম কমান্ড পর্যন্ত এমন সব ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টি হবে যারা স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সর্বাবস্থায় জতির নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। ইবাদত মুআমালাত, মুআশারাতসহ দীনের সার্বিক কাজের ব্যবস্থাপনায় হতে পারবে তারা সিদ্ধহস্ত। যাদের কাছে ঈমান হবে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, ইসলামী মূল্যবোধ হবে সব ধরনের পরিস্থিতির উর্ধ্বে। অর্থাৎ, যে কোন অবস্থায় তারা ইসলামী বিধানাবলীকে দিবেপূর্ণ অগ্রাধিকার।

জিহাদী ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইসলামী নেতৃবৃন্দ অলসতা ও কাপুরুষতা নামের মানসিক ব্যাধি থেকে থাকবে সম্পূর্ণ মুক্ত। গ্রেফতারের মতো বিপদেও

শিকার হয়ে গাজী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। যারা মানুষের মানসিক ও দৈহিক সব ধরনের প্রশিক্ষণ দিতেও হবে যথাযথ যোগ্য। এরা যে কোন ধরনের প্রশিক্ষিত কাফির সেনার মুকাবিলায় লড়াই চালিয়ে যেতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

যেহেতু দীনী প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ইসলামী দলসমূহ ইসলামের মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে দীনের হিফাজত করতে এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়িম করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই সেসব প্রতিষ্ঠানে এবং সংগঠনে জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকা চাই। অন্যথায় উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ নিজেদের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলবে। আর যদি তারা পূর্বে জিহাদী ট্রেনিং গ্রহণ না করে থাকেন এবং জিহাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে ট্রেনিংবিহীন মুজাহিদীনে কিরামের ভূল-ভ্রান্তি বেশি হবে, দীর্ঘ হবে তাদের আন্দোলন। এতে করে তারা পড়ে যাবেন নানা রকম চক্রান্তে। পরিস্থিত এমন দাঁড়াবে, দাঁত পর্যন্ত ঘেমে যাবে। শ্লোগানকে জিহাদ মনে করে নেতৃবন্দ তাদের কর্মী বাহিনী থেকে আত্মগোপন করবে এবং একটি এক সংগঠন দশ বারো খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এ সকল দুঃখজনক ঘটনার দায়-দায়িত্ব পড়বে সম্পূর্ণ রূপে সেসব ইসলামী নেতৃবৃন্দের উপর যারা এই সোনালী সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছেন না। এজন্য প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে, সম্মিলিত কিংবা একাকী যেভাবেই হোক না কেন, উল্লেখিত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যেকটি সদস্যের ইসলামের কালিমা-বুন্দী কল্পে মুসলমানদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে জিহাদী টেনিং নিয়ে নেয়া চাই। এই মহাসুযোগকে হাতছাড়া করা চাই না, যা শুহাদায়ে কিরামের তাজা খুনের বদৌলতে অল্প দিনের জন্য হাসিল হয়েছে। পূর্ববর্তী সংগঠনসমূহের ভুল-ভ্রান্তি এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে, কেননা তারা কোনভাবেই তারবিয়াত ও ট্রেনিং গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু আগামী সংঘটিত ভুল-ভ্রান্তিসমূহ থেকে দৃষ্টি ফেরানোর সুযোগ নেই। কেননা আজকে সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগকে কাজে না লাগানো যৌথ ভুল ছাড়া কিছু নয়। খোদা না করুন, সামান্য সময়ের ভ্রান্তির দরুন শতাব্দিব্যাপী মাসুল উঠাতে না হয়।

কবি বলেন–

وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی انکھوں نے

لمحوں نے خطاکی تھی صدیوں نے سزا پائی

যে যুগটা ও দেখেছে ইতিহাসের চক্ষুসমূহ; কয়েকটি মুহূর্ত ভুল করেছে, (কিন্তু) সাজা পেয়েছে কয়েকটি শতাব্দি।

আমরা পূর্ণ আশাবাদী, মিল্লাতের নেতৃবৃন্দ পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা ও কাফিরদের চরিত্র এবং মুসলমানদের অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমান অবস্থা থেকে ফায়দা হাসিল করবেন এবং উম্মাহকে রাহনুমায়ী করবেন ইনশাআল্লাহ।

কেননা কবি বলেন–

موسم اچھا پانی وافرمٹی بھی ذرخیز

جس نے اپنا کھیت نہ سنچا وہ کیا دھتاں

মৌসুম ভালো, পানি পর্যন্ত, ভূমিও উর্বর, (এরপরও) যে নিজ ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করলো না সে কেমন কৃষক?

জিহাদী সংগঠনের প্রয়োজন

রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল দীনী সংগঠনের জন্য এখন জরুরী হলো তাদের সদস্যদের উপর জিহাদী ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করে দেয়া। সাথে সাথে তাদেরকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে জিহাদী সংগঠনগুলো আরো মজবুত ও সুশৃঙ্খল হতে পারে, মুক্ত থাকতে পারে সব ধরনের গলদ পদক্ষেপ ও প্রোপাগান্ডা থেকে। অবশ্য উল্লেখিত বিষয়ে পদক্ষেপটা প্রথম নিতে হবে সেসব সৌভাগ্যবান জিহাদী সংগঠনগুলোকে, যারা আফগানিস্তান কিংবা অন্য কোন জিহাদী আন্দোলনের সময় অস্তিত্ব লাভ করেছে। সাথে সাথে তারা নিজেদেরকে গুছিয়ে নিয়েছে এবং নিজেদের একমাত্র মিশন হিসাবে জিহাদী রাস্তাকেই নির্বাচন করেছে। যারা কোন বিশেষ

এলাকা নিয়ে কাজ করছেন না বরং তাদের সংগঠনের জানবাজরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই পৌঁছতে পারছেন, জানবাজী রেখে তাগুতী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করছেন। এ ধরনের সংগঠনের প্রয়োজন প্রত্যেক যুগে আজকের বিশ্বেতো মুসলমানদের খুন পানির মতো সস্তা, তাদের মান-ইজ্জত ঠাট্টা বিদ্রুপের শিকার। এমতাবস্থায় এ ধরনের সংগঠনের এতো বেশি প্রয়োজন, একজন মানুষের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস যতো বেশি প্রয়োজন। এই মুহূর্তে উম্মাতের জন্য জিহাদ সবচে' বড় নিয়ামত। আজ জালিম কাফির গোষ্ঠী পৃথিবীর নানা স্থানে মুসলমানদের উপর জুলুম করা থেকে শুধু এজন্য বিরত রয়েছে যে, তারা জিহাদী সংগঠনগুলোর ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত।

যদি খোদা না খাস্তা মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের সংগঠন না থাকতো এবং জানবাজ লড়াকু কিছু মুজাহিদ না থাকতেন, প্রাণের চেয়ে ঈমানকে বেশি প্রিয় জ্ঞানকারী কিছু খোদার সেনা না থাকতেন তাহলে অনেক আগেই মসজিদে আকসার স্থলে 'হাইকালে সুলাইমানী' নির্মিত হতো, বসনিয়া নামক কোন মুসলিম দেশ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যেতো, সোমালিয়ার উপর আমেরিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতো, আফগানিস্তানে রুশী সেনাদের পরাজয়ের পরিবর্তে মস্কোর আশপাশে হাজারো মুসলমানের লাশ ঝুলানো হতো, খুনের নদী বইতো মুসলমানদের রক্তে, ইন্ডিয়াতে বাবরী মসজিদের মতো অসংখ্য ঘটনা ঘটতো প্রতিদিন; শিবসেনা, বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও আর.এস.এস-এর মতো সেখানকার চরমপন্থী দলগুলো অসংখ্য মুসলমানের রক্তে খুনের নদী বইয়ে দিতো।

কাফিরদের খুন ও হৃদয়ে ইসলামের শত্রুতার লাভার উদগিরন হচ্ছে। কিন্তু তাদের ভয় হলো সেসব লোকের, যাদেরকে তারা চরমপন্থী ও মৌলবাদী বলে গালি দেয়। কাফিররা মুসলমান দেশসমূহের শাসকদেরকে ভয় পায় না। কারণ, তারা জানে তারা এক বোতল মদের বিনিময়ে বিক্রি হয়। কাফিরদের কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্যের ভয় নেই, কারণ তারা জানে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্যরা শাসকবৃন্দ কর্তৃক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। তাদের ভয় শুধু সেসব বোমা হামলার যেগুলো ইসরাইলের সামরিক এলাকাগুলোয় সংঘটিত হয়। তাদের ভয় শুধু সেসব বোমা হামলার যেগুলো ইন্ডিয়ান

সৈন্যের গাড়ীগুলো উড়িয়ে দেয়। তাদের ভয় শুধু উমর আব্দুর রহমানের মতো অন্ধ আলিমদের, যারা ইসলামের পক্ষে দ্বিধাহীন চিত্তে কথা বলেন। তাদের ভয় শুধু সেসব ইউরোপের নওজোয়ানদের যারা বসনিয়ার হিফাজত ও নিরাপত্তার জন্য জিহাদী প্রস্তুতি নিয়ে লন্ডন ও ফ্রান্সের রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাদের ভয় শুধু শামিল বাসায়েভের, যিনি মাত্র কয়েক জন জানবাজকে সাথে নিয়ে গোটা রাশিয়াকে মাথা ঝুঁকাতে বাধ্য করেছেন। তাদের হৃদয়ে শুধু জেনারেল দুদায়েভের ভয়, যিনি ইমাম শামিলের ইতিহাসকে চাঙ্গা করেছেন।

জি হ্যাঁ; তাদের দেমাগে সেই করুণ স্মৃতি এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে যে, কয়েকজন নাম-ঠিকানাবিহীন মুজাহিদ, যারা সোমালিয়া থেকে আমেরিকাকে সমূলে উৎপাটন করে দূরে নিক্ষেপ করেছিলো। তারা ভয় পায় সেসব মুসলমান সোনার ছেলেদেরকে, যারা কোন না কোনভাবে অস্ত্র-শস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া ও চেচনিয়া ইত্যাদি দেশের মুজাহিদীনে কিরামের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

আপনার কাছে এসব কথা অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে; কিন্তু আপনি সরজমিনে তদন্ত করে দেখুন, পড়ে দেখুন কাফিরদের কালো হৃদয়ে লিখিত কালো হরফগুলো, দেখতে পাবেন তাদের করুণ হাল; আপনি নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে, আজকে মুসলমানরা যতোটুকু নিরাপদে রয়েছে, তার মূলে রয়েছেন সেসব জানবাজ মুজাহিদীনে কিরাম যাদেরকে আমরা অহরহ নানা রকম গালিগালাজ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করি না। এ ব্যাপারে আমরা দুটি ইসলামের শত্রু রাষ্ট্রের আলোচনা তুলে ধরছি।

আমেরিকার ভীতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে ত্রিশ হাজার পারমাণবিক অস্ত্র ছিলো, যেগুলোর অধিকাংশের রুখ ছিলো আমেরিকার দিকে। আমেরিকা এই ভয়াবহ অবস্থা সামাল দেয়ার জন্য নিজেদের গোয়েন্দা সংস্থা সিআই একে গুছিয়ে নিলো এবং তাকে বরাদ্দ দিলো শত শত কোটি ডলার। এক পর্যায়ে বিভিন্ন কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব বিলীন হলো। কিন্তু আমেরিকা

তার সেই গোয়েন্দা সংস্থা গুটিয়ে নেয়নি। এমনকি তাদের জনবল ও বরাদ্দও কমায়নি বিন্দুমাত্র। এখন তারা বলছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমেরিকার কোন আশংকা না থাকলেও ইসলামী মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে আমেরিকার জন্য বেশ আশংকা রয়েছে। এজন্য সিআই এ এর প্রয়োজন রয়েছে এখনও। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছরে আমেরিকায় ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় ইসলামী নেতাকে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করা এই সি.আই.এ-এর অপকর্মেরই অংশ বিশেষ।

আমেরিকার এ ধারণা সত্য যে, ইসলামী বিপ্লবের শক্তি খুব দ্রুত বোড় চলছে এবং তা সকল ইসলামবিরোধী শক্তির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাথে সাথে একথাও সত্য যে, সকল ইসলামবিরোধী শক্তির নেতৃত্ব দিচ্ছে এই আমেরিকা। এজন্যই আমেরিকাকে আজ ইসলামী শক্তির বিপক্ষ মনে করা হচ্ছে। অথচ ইসলামী শক্তির নির্দিষ্ট টার্গেট আমেরিকা নয় বরং ইসলামী শক্তির টার্গেট হলো ইসলামবিরোধী শক্তি।

আমেরিকা যদি ইসলামের শত্রুতা ছেড়ে দেয় তাহলে তখন সে আর ইসলামী শক্তির টার্গেট থাকবে না। কিন্তু যতোক্ষণ সে ইসলামের খেলাফ লড়াই চালিয়ে যাবে, খুব স্বাভাবিকভাবেই তার বিরুদ্ধেও লড়াই অব্যাহত থাকবে।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমেরিকা তার ধারণা মতে যেসব ইসলামবিরোধী অভিযান চালিয়েছে এবং এখনো চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ইসলামী আন্দোলনের যতোটুকু ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি তা এগিয়ে গেছে। সেই আন্দোলনের মকবুলিয়াত বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক গুণ বেশী। অবশ্য আমেরিকা বিষয়টি বুঝতে পারছে বলে মনে হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়ানের বিরুদ্ধে শীতল যুদ্ধে জেতার দাবীদার এবং নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তির ধারণাকারী আমেরিকা এ বিষয়টি নিয়ে খুবই ভীত ও সন্ত্রস্ত। তার এই ভীতি প্রকাশ পাচ্ছে তাদের নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে। ইয়াহুদীদের অনুগত সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্‌টন জর্দান-ইসরাঈল চুক্তি সাক্ষর অনুষ্ঠানে এক ভাষণে বলেন–

ইসলামী চরমপন্থীরা! তোমরা কখনো কৃতকার্য হাতে পারবে না এবং তোমাদেরকে কৃতকার্য হতেও দেয়া হবে না। তোমরা অতীত, তোমরা বর্তমান বা ভবিষ্যত নও। (অর্থাৎ, বর্তমানেও তোমরা কোন কিছু করতে পারবে না, ভবিষ্যতেও না।)

বাহ্যত এসব শব্দ দ্বারা কৃত্রিম দৃঢ়তা প্রকাশ করা হলেও কার্যত এর পিছনে সীমাহীন ভীতি ও কাপুরুষতা প্রকাশ পেয়েছে। সাথে সাথে এসব কথায় ইসলামের দুশমনী ও ইয়াহুদী প্রীতিও প্রকাশ পেয়েছে। অতি সাম্প্রতিক বর্ধমান ইসলামী শক্তির উত্থান ও শক্তি দেখে ভীত হয়ে আমেরিকান কংগ্রেসের এক সদস্য এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক পদার্থের চোরাচালানী না রুখা হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্র-শস্ত্রগুলো ইসলামী চরমপন্থীদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে, যার নিশানা হবে আমেরিকা।

ভারতীয় সরকারের ইসলাম বিদ্বেষ এবং...

নিজকে মিনি পরাশক্তি মনেকারী, হিন্দুয়ানী চরমপন্থার দুর্গন্ধময় ভারত এখন ধীরে ধীরে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মালদ্বীপের মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন হুমকি স্বরূপ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ সেও ইসলামী শক্তিকে ভয় পাচ্ছে ভীষণভাবে। সাথে ভারতীয় মুসলমান নিধনের পুরাতন কর্মসূচীকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করছে।

ইন্ডিয়া কাশ্মীরে আজ পর্যন্ত চল্লিশ হাজারেরও অধিক মুসলমানকে হত্যা করেছে। সহিংসতায় মারা গেছে সর্বমোট প্রায় আশি হাজারেরও অধিক লোক। সারা ভারত মিলে ১৯৪৭ থেকে এ নাগাদ আট হাজারের অধিক মুসলমান নিধন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। এসব দাঙ্গার অনেকগুলোতে খোদ পুলিশ বাহিনী মুসলমান যুবকদেরকে ঘর থেকে জোর করে বের করে হত্যা করেছে, পুড়ে মেরেছে অনেক নিষ্পাপ অবলা

নারী-শিশুকে। ক্ষত-বিক্ষত ও পোড়ানো লাশগুলো তারা ভাসিয়ে দিয়েছে নদীতে। পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিম পাকিস্তান, উত্তর প্রদেশ (ইউপি) কিংবা বিহারে '৪৭ -এর ভাগাভাগির সময় হাজারো মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

শিবসেনার নপুংশক প্রধান বাল থ্যাকারে ইন্ডিয়ান মুসলমানদের জন্য বোম্বাই থেকে হজ্জে গমনের পথের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এজন্য গত কয়েক বছর ইন্ডিয়ান সরকার বোম্বাই থেকে পানি জাহাজে করে হাজী প্রেরণ করতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ (আরএসএস) এর রাজু ভায়া বলেছে, ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান কিংবা কবরস্থান ছাড়া তৃতীয় কোন স্থান নেই। তাদেরকে এ দুটির যে কোন একটি গ্রহণ করতেই হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেক্রেটারী অশোক নিংগাল বাবরী মসজিদেরপর 'ফাশী' ও মথুরার মসজিদসমূহ ধ্বংসের ঘোষণা দিয়েছিলো।

যদি এ বছর ও বিগত এক দু'বছর কিছু জিহাদী সংগঠন হিন্দুদের অমরনাথ যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করতো এবং হিন্দুদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকি না দেয়া হতো, তাহলে মুসলমানদের আরো অসংখ্য ঐতিহাসিক মসজিদ ধ্বংস করে ফেলতো হিন্দুরা। এসব হুমকি ধমকির দরুণ ভারতীয় সরকারের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কাশী ও মথুরা গিয়ে মসজিদসমূহের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অথচ এই মন্ত্রীরই সামনে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা হয়।

ভারতীয় মুসলমানরা আজ এমন ভয়-ভীতির মধ্যে জীবন-যাপন করছে, যেমন ভয়-ভীতির সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমানরা দিনযাপন করতো। যেখানে দীর্ঘদিন তারা দেশ চালিয়েছে, সেখানে আজ তারা নিজেদের ভবিষ্যত অন্ধকার দেখছে।' ৪৭-এর সময়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে আগত এল কে আদভানীসহ অন্যান্য চরমপন্থী হিন্দু নেতারা এখন ভারতীয় রাজনীতির লাগাম ধরেছে। তাজ্জব লাগে, কল্যাণ সিংয়ের নেতৃত্বে ও ইউপির ক্ষমতাকালে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার অপরাধে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট তাকে মাত্র একদিনের কারাদণ্ড দিয়েছিলো। এরপর তারা বিশ্বব্যাপী চেঁচিয়ে বেড়ালো যে, ভারতীয় বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। অতি সম্প্রতি ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট আরেকটি অন্যায় সিদ্ধান্ত শুনিয়েছে। সুপ্রীম

কোর্ট সুপারিশ করেছে যে, সারা ভারতে সকল ধর্মবর্ণের লোকদের জন্য সম্মিলিত সিভিল কোর্ট চালু করা হোক। যার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, মুসলমানরা বিয়ে, তালাকসহ অন্যান্য একান্ত ধর্মীয় বিষয়াদিও ইসলামী আইন অনুযায়ী করতে পারবে না। বরং তা করতে হবে সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী আইন মুতাবিক। কারণ তারা তো একটি হিন্দু রাষ্ট্রের নাগরিক, সে হিসাবে সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অভিন্ন আইন তাদেরকে মানতে হবে। (নাউজুবিল্লাহ।)

এই অন্যায় রায়ের পিছে অনেক নাপাক উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম একটি হলো, তারা মুসলমানদেরকে একাধিক বিয়ে থেকে রুখতে চায়। ইসলামী আইন অনুযায়ী শর্ত সাপেক্ষে যেহেতু ভারতীয় মুসলমানরা একাধিক বিয়ে করছে এবং এতে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা হিন্দুদের জন্য বিপজ্জনক (?)। এজন্য তারা সম্মিলিত সিভিল কোর্ট ব্যবস্থা চালু করে সেই একাধিক বিবাহ প্রথাকে রুখতে চায়। উল্লেখ্য, বেশ কিছু দিন আগে কেন্দ্রীয় লোকসভার বিজেপির সদস্য প্রফেসর অজয় কুমার অত্যন্ত উষ্ণ ভাষায় এক অধিবেশনে বলেছে, 'মুসলমানদের জন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা এসে ভারতে বসতি স্থাপন করছে।'

প্রফেসর অজয় বাবুর এই বিবৃতি সর্বৈব মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্যথায় ভারতের আর্থিক দুরবস্থা ও অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার কথা কে না জানে। এটি পৃথিবীর একক দেশ, যেখানে কোটি কোটি মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে থাকে, যেখানে অসংখ্য বাস্তুহারা মানুষ ফুটপাতে জীবন-যাপন করে, যে দেশে দেড় কোটির অধিক মানুষ প্রতিবন্ধি, যে দেশে এইডসের রোগীর সংখ্যা সারা পৃথিবীর সকল দেশের এইডস রোগীর সংখ্যার চাইতে বেশি, যে দেশে এক টুকরা হাড্ডির জন্য কুত্তারা হাহাকার করে ফিরে সে দেশে কিনা প্রতিবেশী পাকিস্তান-বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা এসে লুকিয়ে বসতি স্থাপন করছে! এমন হাস্যকর কথা অন্য কেউ না বলতে পারলেও অবশ্য ভারতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ বলতে পারেনা। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন ভারতের লোকদের চাইতে অনেক ভালো এবং অনেক উন্নত। তাছাড়া এ দুটি দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান হওয়ায় এখানে অনেক ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন

রয়েছে, রয়েছে সীমাহীন সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। এখানে আযানের ধ্বনিতে সকালের ঘুম ভাঙে। গোটা মুসলিম উম্মাহর সাথে রয়েছে এ দু'দেশের উষ্ণ সম্পর্ক। একজন মুসলমান একটি মুসলিম দেশে মরতেও শান্তি পায়। এমতাবস্থায় কী কারণে, কোন দুঃখে বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী মুসলমানরা দলে দলে ভারতে গিয়ে বসতি স্থাপন করছে দয়া করে কেউ কি বলতে পারবেন? প্লিজ, এমন ডাহা মিথ্যা কথা আর বলবেন না। অনুরোধ রইলো। আপনারা হিন্দু বলে মিথ্যা বলা বৈধ হবে না; মিথ্যা কোন ধর্মেই বৈধ নয়।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে যে, কয়েক হাজার পাকিস্তানী ভারতে বেড়াতে এসে পাকিস্তানে ফিরে যায়নি। অথচ এরা মূলত চোরাচালানী যারা দু'টি পাসপোর্ট ব্যবহার করে। একটি পাসপোর্টে (পাকিস্তানী) ভারতে আসে, আরেক পাসপোর্টে (ভারতীয়) পাকিস্তান ফিরে যায়। বিষয়টি ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বুঝতে হবে। হ্যাঁ! যেসব মেয়ের বিয়ে হয় তাদের সেসব আত্মীয়ের সাথে, যারা ভারতের নাগরিক, তারা হয়তো পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারে না। এ ফিরে না যাওয়াটা কি আদৌ কোন অপরাধ? এই দুই শ্রেণী ছাড়া যাদের সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনা রয়েছে, তারা এমন ভারতে বসবাসের জন্য আসতে পারে না যেখান থেকে সে দেশের বাসিন্দারা অন্য দেশে বসবাসের জন্য কে কার আগে যাবে এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। শুধু পাকিস্তানী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে এমন বিশ লাখ লোকের লিস্ট রয়েছে যারা ভারত থেকে পাকিস্তানে এসে বসতি স্থাপন করেছে।

হিন্দুইজম ও শিরকের অশুভ প্রভাব ভারতকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। অন্যথায় এই ভরতবর্ষ তো মুসলমানরা দীর্ঘদিন শাসন করেছে। তখন এ দেশকে স্বর্ণের চড়ুই বলা হতো। মুসলমানদের শাসনামলে এদেশে সর্বোপরি সুখ-সমৃদ্ধি ছিলো। আর এখন ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে প্রতিদিন অন্তত পক্ষে দশজন মহিলাকে যৌতুকের দরুন জীবিত দগ্ধ হতে হয়। যেখানে পূত-পবিত্র নারীর সংখ্যা খুবই কম। ভারত এমন একটি দেশ যেখান থেকে অশ্লীলতা সারা পৃথিবীতে সাপ্লাই দেয়া হয়। যেখানে এক

পয়সায় মানুষ খুন হয়, যেখানের অলিতে-গলিতে মদ ও হিরোইনের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, যেখানে ইজ্জত ও ইনসানিয়াত খোলাবাজারে নিলামে বিক্রি হয়। এই ধরনের দেশে কিনা মানুষ ভিন্ন দেশ থেকে এসে লুকিয়ে বসবাস করে।

এদেশে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে তাহলে রয়েছে এখানকার দীনদার মুসলমানরা। এদের দীনদারীর দরুন বহির্বিশ্বে ভারতের সুনাম রয়েছে, এদের পরিচিতির দরুন বিশ্বের অন্যান্য দেশে ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রয়েছে।

প্রফেসর অজয় বাবুর ফিতনা সৃষ্টিকারী এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য হলো, ভারতীয় মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া ও সংকীর্ণ করা। তার উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে যেন পাকিস্তানী, বাংলাদেশী বলে জেলে ঢুকানো হয় এবং তাদের জীবন বরবাদ করে দেয়া হয়। অন্যথায় অজয় বাবুরও সঠিক বিষয়টি অজানা থাকার কথা নয়।

কথা এখানেই শেষ নয়, কয়েক বছর যাবত টাডা (এখন পোটা) নামক একটি বৈষম্য মূলক আইনের মাধ্যমে ষাট হাজারেরও বেশি মুসলমানকে জেলে ঢুকানো হয়েছে এবং বিনা বিচারে জেলে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এই টাডা আইনের আওতায় বর্তমানে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় মুসলিম নেতা জেলে অন্তরীণ রয়েছেন। এই আইনে জামিন নেয়ারও যেমন কোন বিধান নেই, তেমনি পুলিশের জোরপূর্বক আদায় করা জবানবন্দী থেকে রুজু করারও সিস্টেম নেই। এই আইনে পুলিশ বিনা বিচারে কাউকে আজীবন জেলে রাখতে পারবে।

তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ইতোমধ্যে সেখানে অনেক দীনী মাদরাসা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা -এর মতো বিশ্বখ্যাত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও চালানো হয়েছে পুলিশী তদন্ত। এ পর্যন্ত কর্ণাটক ও তামিলনাডুর কয়েকটি ইসলামী পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বর্তমানে ভারতে দু'ধরনের রাজনৈতিক দল রয়েছে। এক ধরনের দল তো সরাসরি মুসলমানদের দুশমন। এরা ভরতে অবস্থিত প্রত্যেক মুসলমানকে পাকিস্তান ও আই এস আই-এর এজেন্ট মনে করে এবং

ভারতে মুসলমানদের অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারে না। এসব দলের মধ্যে বিজেপি, আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা ও বজরং দল শীর্ষস্থানীয়। এসব দলের মধ্যে কিছু কিছু দল বাহ্যিকভাবে রাজনৈতিক; আর কার্যত সামরিক।

আরেক ধরনের দল সরাসরি মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা প্রচার করে। এদের মধ্যে জনতা দল, সমাজবাদী পার্টি শীর্ষস্থানীয়। আর কংগ্রেস ও সিপি এম ইত্যাদি পার্টি মাঝামাঝি অবস্থান করে। এদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমানদের উপর জুলুম করার জন্য আর কিছু লোক দুঃখ প্রকাশ করার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। তবে চরমপন্থী হিন্দু সব দলেই আছে। এমনকি নরসীমা রাও -এর মতো লোক চরমপন্থী আরএসএস পার্টির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর মধ্যে চরমপন্থী হিন্দু কর্মচারী ও কর্মকর্তারাই নিয়োজিতদের মুসলমানী কোর্ড নাম ব্যবহার করে। এটা তাদের সূক্ষ্ম কৌশল।

সরকারী হিসাব মতে ভারতে মূল জনসংখ্যার ১১% মুসলমান। অথচ সরকারী চাকরিতে ১% লোক মুসলমান নেই। আর কার্যত মুসলমানদের সংখ্যা ১১% থেকে অনেক বেশি।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় যে, সেখানকার গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ এবং স্বাধীনতার ৪৫ বছরের মধ্যে ৪০ বছর ক্ষমতা পরিচালনাকারী পার্টি কংগ্রেসের সম্মিলিত কর্মসূচী হলো, ৯৬, ইং এর জাতীয় নির্বাচনের রায় বিজেপি এর অনুকূলে ছেড়ে দেয়া হবে। অতঃপর বিজেপি ক্ষমতায় এসে কাশ্মীরী ও অন্যান্য মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতন করে তাদের কোমর ভেঙ্গে দিবে। তখন সারা পৃথিবীব্যাপী বিশেষত মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে চরম প্রতিবাদ উঠবে (বাস্তবেও তাই হয়েছে), পরিণতিতে বিজেপির পতন হবে, মুসলমানদের ও কোমর ভেঙ্গে যাবে। মাঝখানে লোকেরা কংগ্রেসকে উদ্ধারকর্তা মনে করে পরবর্তীতে তাদেরকে আবার ক্ষমতায় বসাবে।

(বাস্তবেও তাই হয়েছে। কারগিল লড়াইয়ে মুসলিম সৈন্যদেরকে লেলিয়ে দিয়ে হত্যা, গুজরাটের গণহত্যা সহ ছোট-বড় যতো হত্যাকাণ্ড বিজেপি করেছে, সবগুলোতেই কংগ্রেস সাক্ষী গোপালের ভূমিকা রেখেছে এবং মিছে মায়াকান্না কেঁদেছে। তারপরও বোকা মুসলমানরা কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে চলতি টার্মে জয়ী করেছে। অবশ্য এছাড়া কোন উপায়ও তাদের সামনে বাহ্যত নেই।) -অনুবাদক।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করলেই নয়। আর তা হলো, ভারতেও স্পেনের মতো মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে চালানো হচ্ছে তথ্যসন্ত্রাস। আজকে সেখানে নিম্নোক্ত কথাগুলো জোরেসোরে ছড়ানো হচ্ছে—

১. ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম থেকে বের হওয়া একটি ধর্ম।

২. মুসলমানরাও হিন্দুদের মতো শিবলিঙ্গের পূজা করে। তারা (নাউজুবিল্লাহ) হাজরে আস্ওয়াদকে শিবলিঙ্গ মনে করে।

৩. যেসব মানুষ নওমুসলিম হয়, তাদের বংশানুক্রমিক মুসলমানদের মতো মান-ইজ্জত লাভ হয় না। বরং তারা মুসলিম সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমান বলে গণ্য হয়।

৪. মুসলমান মোগল বাদশাহ এবং আওরঙ্গযেব, আলমগীর (রহ.) অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করেছেন। তিনি তখন পর্যন্ত নাস্তা করতেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুদের দেড় মণ পৈতা জ্বালানো না হতো। তিনি অসংখ্য মন্দির ও আশ্রমকে মসজিদ ও ঈদগাহ বানিয়েছেন।

৫. ভারতীয় মুসলমান তাদের বাপ-দাদার ধর্ম হিন্দুত্বে ফিরে আসা চাই। কেননা ইসলাম তো ভারতের ধর্ম নয়। বরং ভারতের ধর্ম হলো হিন্দু। তাই হিন্দুস্থানে থাকবে শুধুমাত্র হিন্দু, হিন্দুইজম ও হিন্দু ধর্ম।

৬. ইসলাম ধর্ম আগ্রেশী শেখায়। এতে গোশত খাওয়া জয়িয এবং একাধিক বিয়েও বৈধ -ইত্যাদি ইত্যাদি।

যথাযথ দিক নির্দেশনা না থাকায় এখানকার মুসলমানরা এসব কথা শুনে পেরেশান হয়ে যায়। আবার কখনো প্রভাবান্বিতও হয়। এরা আদৌ এসব কথার জবাব দিতে পারে না। এখন অনেক মুসলমান তো হিন্দুদের সাথে সুর মেলাতে বাধ্য হচ্ছে। আবার কেউ কেউ নিজেরাই এ ধরনের কথা বলে বেড়াচ্ছে যে, আল্লাহ, রাম, ভগবান একই জিনিস- নাউজুবিল্লাহ।

ভারতে আজকাল যতোসব দুঃখজনক বিষয় গোচরীভূত হয়। হিন্দু ধর্ম তো কয়েকটি কুসংস্কারের নাম। তাদের উদ্দেশ্য মানুষের সংশোধন, আদর্শ সমাজ গঠন কিংবা চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন নয়। বরং তাদের ধর্মের সারকথা হলো 'স্বার্থের পূজা।' যে তোমাকে কিছু দেয়, সে তোমার দেবতা; তার পূজা করো। প্রত্যেক শক্তিশালীর কাছে মস্তক অবনত কর, যাতে সে তোমার ক্ষতি না করে।

গোটা হিন্দু ইতিহাস নারী ও পয়সার আশপাশে ঘুরেফিরে। তাদের সকল ঐতিহাসিক যুদ্ধের কারণ পয়সা ও নারী ছিলো। রামায়ণ ও মহাভারত যে দুটিকে হিন্দুরা নিজেদের পবিত্র মহাগ্রন্থ মনে করে, সে দুটি গ্রন্থ এসব গল্পে ভরপুর। সেসবে উল্লেখ রয়েছে, লংকার রাজা রাবণ কিভাবে রামচন্দ্রজির স্ত্রী সীতাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলো এবং রাম কিভাবে চৌদ্দ বছর তার স্ত্রীকে ফিরে পেতে চেষ্টা-কুশেশ করলো, অতঃপর কিভাবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে সীতাকে উদ্ধার করলো, তার সবিস্তার বর্ণনা। ভগবান কৃষ্ণ ছোট বেলায় হাতি চড়াতো এবং অল্প বয়সে মেয়েদের পিছে ঘুর ঘুর করে বেড়াতো ইত্যাদি ঘটনা। দেখুন, হিন্দুদের বিশেষ কোন মাবুদ বা ইলাহ নেই।

ভারতের অনেক হিন্দু মুসলমান পীর-বুযুর্গদের মাজারে যাতায়াত করে এবং তাদের কবরে চাদর দেয় ও তাদের কবরে সিজদাহ করে। এটাই যেন তাদের ইবাদত। তারা এসব পীর-বুযুর্গকে হাজাত পূর্ণকারী মনে করে। এ দুয়ারে ও দুয়ারে কপাল ঠেকানো যেন তাদের আদব। এরা মুহাম্মাদ বিন কাসিম (রহ.)-এর উদারতা ও মহানুভবতা দেখে তাকে নিজেদের খোদা মনে করে বসেছিল।

যে হিন্দুরা অসংখ্য বছর মুসলমান শাসকদের জুতা ধোয়া-মোছা ও উঠানোর কাজে নিয়োজিত ছিলো; দুশো বছর পর্যন্ত যারা ইংরেজ শাসকদের গোসলের পানির ব্যবস্থাপনায় লিপ্ত ছিলো, এরা কিনা এক পর্যায়ে মুসলমানদের দয়ায় ও ইংরেজদের কুটিল চক্রান্তে একটি দেশের ক্ষমতা লাভ করলো, যারও কিনা মুসলমানরাই স্থপতি! তারাই আজ অহংকারে ভাতকে বলে অন্ন, নাক যেন তাদের উর্দ্ধাকাশে; তাদের চাল-চলনে মনে হয়, তারা যেন মাটিতে নেই।

দেখুন, আমরা আজ একটি করুন বাস্তবতার শিকার। এটা আমাদের অনৈক্যের কারণে হয়েছে। আজকে ভারতের হিন্দুরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন সেখানের মুসলমানদেরকে হেয় ও নীচ মনে করে। অথচ গতকাল পর্যন্তও তারা মুসলমানদের জুতা সোজা করতো। হিন্দুরা তাদের ধর্মকে পৃথিবীর সবচে' পুরাতন ধর্ম বলে গর্ব করে এবং ইসলামের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি (না থাকলেও) অন্বেষণের ধৃষ্টতা দেখায়। সাথে সাথে নিজেদের ভিত্তিহীন ধর্মকে বাড়িয়ে চাড়িয়ে পেশ করে। আর সেখানকার ও আশপাশের মুসলমানরা অনৈক্যের কারণে তাদের সমুচিত জবাব দিতে পারছে না।

ভারত বর্ষের মুসলমানরা আজ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও কাশ্মীর এ চারভাগে বিভক্ত। এক দেশের মুসলমানরা অন্য দেশের মুসলমানদেরকে চেনে না। যেভাবেই হোক দেশ ভাগ হয়েছে, তাই বলে পারস্পরিক সম্পর্কও কি থাকতে পারতো না। যদ্দরুন মুশরিক হিন্দুরা চার অংশের মুসলমানদের উপর ঐক্যবদ্ধভাবে নানাভাবে জুলুম চালাচ্ছে। কাশ্মীরকে তো ওরা তাদেরভাড়া করা ভূখণ্ড মনে করে সেখানে যাচ্ছে তাই করে চলেছে।

পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব ভারতের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়। বাংলাদেশকে ভারতের কলোনী বানানোর জন্য ভারত আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর ভারতীয় মুসলমানরা তো তাদের বলির পাঠায় পরিণত হয়েছে অনেক আগেই। ভারত সেখানের মুসলমানদের উপর জুলুমের বিষয়টাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে চালিয়ে নিতে চায়। অর্থাৎ সেখানের মুসলমানরা তাদের জুলুমের শিকার হয়ে মারা যাক, কিন্তু তারা আহ্ শব্দটিও করতে পারবে না।

বস্তুত ভারতীয় মুসলমানদের ঈমান ও জীবন উভয়টাই আজ বিপন্ন। কিন্তু চারদিকের কোন দিকেই তাদের কোন সাহায্যকারী ও মদদগার নেই। আরো দুঃখজনক বিষয় হলো, হিন্দুরা তাদের ভ্রান্তধর্ম বাড়িয়ে চাড়িয়ে প্রচার করছে, আর মুসলমানরা তাদের একমাত্র সহীহ ধর্ম ও জীবন-বিধানকে লুকিয়ে চুপিয়ে প্রচার করছে। বুঝি না, এটা কি মজবুরী (অপারগতা) নাকি কমজোরী। এমন করুণ হালতেও ভারতে মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোকের উদ্ভব ঘটেছে, যারা হিন্দুদের দালালীতে লিপ্ত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের সমূলে ক্ষতি সাধন করার ঘৃণ্য চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ওয়াহিদুদ্দীন খান অন্যতম। তথাকথিত লেখক ও পণ্ডিত ওয়াহিদুদ্দীন খান ইসলামের বিকৃতি সাধনে মির্যা কাদিয়ানী, চক্রালবী, পারভেজ এর সমকক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের বিতর্কিত ও বহুল সমালোচিত এই লেখক বলেন, "চতুর্থ শতাব্দীর পর মুসলমানরা ইজতিহাদ ছেড়ে দিয়েছিলো। এরপর মহাত্মা গান্ধী ইজতিহাদের সেই বন্ধ দরজা খুলেন। ইনিই সেই বাহাদুর ব্যক্তি, যিনি ভারতের মুসলমানদেরকে এ কথার দীক্ষা দিয়েছেন যে, যখন কোন সশস্ত্র হিন্দু কোন মুসলিম বসতির উপর হামলা করে বসে, তখন মুসলমানদের কোন মতেই তার মুকাবিলা করা উচিত নয়। বরং তখন তাদেরকে ঘরে বসে আয়াতে কারীমার ওযীফা পাঠ করা চাই।"

এই হলো তার ইসলাম বিকৃতির একটি নমুনা। এই গোমরাহ' এর সাথে যোগ দিয়েছে মাওলানা আখলাক হুসাইন কাসেমীসহ আরো কিছু পথভ্রষ্ট লোক। তারা আজব আজব বিষয়ের অবতারণা করে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। তারা নাকি গবেষণা করে বের করেছে যে, যা কিছু কুরআনে কারীমে রয়েছে, তা নাকি হিন্দুদের রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদিতেও রয়েছে। এজন্য তারা এ বিষয়ক পুস্তকও ইদানীং প্রকাশ করেছে।-নাউজুবিল্লাহ।

মনে হচ্ছে, মুসলমান নামের সুবিধাভোগী এসব গোমরাহ লোক হিন্দুদের অখণ্ড ভারত ও রামরাজ্যের বাস্তবায়ন ও হিন্দুস্থানকে স্পেন বানানোর মিশনে

কাজ করে চলেছে। এরা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জিহাদের জযবাকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তাদের এই চক্রান্ত বাস্তবায়ন হবে না ইনশাআল্লাহ।

হিন্দুস্থানী মুসলমানরা আজ অনেকটা সজাগ। তারা হিন্দুদের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আইবি, সিবিআই-এর সকল চক্রান্ত ধুলিস্যাত করে দিবে-ইনশাআল্লাহ। হিন্দুস্থানের মুসলমানদের এতো সহজে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়, যতো সহজ মনে করছে লালকৃষ্ণ আদভানী, জগমোহল, বালথ্যাকারে ও আশোক সিংগাল প্রমুখ।

ভারতের মুসলমানদের অগ্রসরমান সজাগতা ও জিহাদের সাথে তাদের আন্তরিক সম্পর্ককে অবলোকন করে কিছুদিন পূর্বে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.) এক বক্তৃতায় বলেন–

"ভারতীয় মুসলমানদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ইনশাআল্লাহ ভারতে তাদের অস্তিত্বকে কেউ মেটাতে পারবে না। বরং মুসলমানরাই অদূর ভবিষ্যতে ভারতের ক্ষমতার লাগাম হস্তে ধারণ করবে। মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.)-এর এই ইলহামী শব্দসমূহ ভারতীয় মুসলমানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ইংগিত করেছে। হযরত মাওলানা এর মতো এক মহান ব্যক্তিত্ব ও বিশ্ব পরিব্রাজক ব্যক্তি আবেগতাড়িত হয়ে এধরনের কথা বলতে পারেন না। বরং তিনি আলামত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখেই কেবল এমনটি মন্তব্য করেছেন। বাস্তবেও তাই। আজকে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের সোনালী অতীত দেখে শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আজকে তারা সব ধরনের পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করছে। জিহাদ ও শওকে শাহাদাত তাদের মধ্যে আবারো জিন্দা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যত তারা জেগে উঠবে না, রুখতে পারবে না তাদের বিজয়কেও।

সকল পরিকল্পনা ধুলিস্যাত হয়েছে

একটু বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা মূল আলোচনায় আসছি। কুফরী শক্তি ইসলামকে খুবই আক্রমণের চোখে দেখছে। তাদের বিশেষজ্ঞরা

ইসলাম ও মুসলমানকে অগ্রগতি তথা আমেরিকা, ইউরোপ ও ইয়াহুদী স্বার্থের জন্য সবচে' বড় ও চূড়ান্ত বাধা মনে করছে। তাদের পাণ্ডিতরা ইসলামকে পৃথিবীর জন্য এমন ক্যান্সার ঘোষণা দিচ্ছে, যা সম্মিলিতভাবে সমূলে উৎপাটন করতে হবে বলে মন্তব্য করছে। কিন্তু তারপর এখনও কেন তারা ইসলাম থেকে হাত গুটিয়ে রেখেছে এবং নিজেদের খায়েশ শত ভাগ পূর্ণ করছে না। যতোটুকু ওরা করছে বা করাচ্ছে তা তাদের ইসলাম দুশমনির একশ ভাগের দশভাগও নয়। কিন্তু কেন? কী রয়েছে এতে রহস্য? এদের বিরত থাকার প্রকৃত তথ্য টা কি? কেউ কি জানেন?

অবস্থা ও প্রেক্ষাপট বলছে, ওরা ভয় পাচ্ছে সেই ইসলামী শক্তিকে, যা বেসরকারীভাবে সেসব জানবাজ জওয়ানকে ভয় পাচ্ছে, যারা এখনও ইউরোপের শরাব ও নারীর গণ্ডদেশের আসক্ত হওয়ার পরিবর্তে জান্নাতী হুরদের আসক্ত হয়েছে। তাদের সেসব দিওয়ানা, সাবীলুনা, সাবীলুনা, আল-জিহাদ, আল-জিহাদ –এর শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলে। তাদের রাহে হকের সেসব মুসাফিরের ভয় হচ্ছে, যারা অর্থ-বিত্ত উপার্জনের জন্য নয়, বরং ইসলামের ইজ্জত রক্ষা ও ইসলামী উম্মাহর হিফাজতের লক্ষ্যে সব রকমের সীমানা একাকার করে গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে।

আমেরিকা ও ইউরোপ সাধারণ মুসলমানদেরকে একথা বুঝানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে যে, মৌলবাদী ও জিহাদপ্রিয় গুটিকয়েক মুসলমান অন্য মুসলমানদের সকল পেরেশানী ও সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ। একদম বাজে কথা। কেউ এ ধরনের কথা ঘুর্ণাক্ষরেও বিশ্বাস করবেন না। বস্তুত আজ মুজাহিদীনে কিরামের দরুন মুসলমানদের উপর থেকে কত রকমের আগ্রাসন যে বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। এ ধরনের জানবাজ মুজাহিদীনে কিরাম না থাকলে যে বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে কি হতো, তা বুদ্ধিমান সকলেরই ধারণা আছে।

দেখুন, তেল সম্পদের উপর মুসলমানদের একচ্ছত্র কন্ট্রোল আমেরিকা, ইউরোপ ও ইয়াহুদীরা কি সহ্য করতে পারছে? এর জন্য তারা করছে নানা রকম চক্রান্ত। শেষ নাগাদ স্রেফ তেলের লোভে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে দখল

করে মসজিদ সমূহ তাদের হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কয়েকটি ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ তাদের জন্য হয়েছে মাথা ব্যথার কারণ। সুদান আফগানিস্তানের ইসলামী ভাবধারা ও পূর্ব আফ্রিকার ইসলামী প্রচারপ্রসার তাদের সাধারণ মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে, কেউ কি বলতে পারবেন?

কোন রকম বাড়াবাড়ি বলছি; ছাড়া এ সময়ের করুণ বাস্তবতা হলো, আজ ইসলামের দুশমনদের কাছে মুসলমানদের অস্তিত্ব ও ইসলামের নামটি পর্যন্ত অসহনীয়। ওদের কাছে যেন মুসলিম নামটিও বেমানান। মুসলমানদের হাতে অতীতে তাদের বাপ-দাদাদের করুণ পরাজয়ের কথা তারা ভুলেনি। সেই লাঞ্ছনাকর ইতিহাসের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য তারা যেমন খুব সতর্ক, তেমনি সদা আতংকিতও।

ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে মুসলমানদের থেকে তারা ছিনিয়ে নিয়েছে খেলাফত, স্বাধীনতা, একতা ও জিহাদ। চাপিয়ে দিয়েছে তাদের উপর সাম্প্রদায়িকতা নিছক দেশপ্রেমসহ নানা রকম ইসলাম অসমর্থিত বিষয়। সাথে সাথে চালিয়েছে বিভিন্নভাবে আগ্রাসন, যাতে মসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করা সহজ হয়।

চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় তারা ইসলামী দেশসমূহের ক্ষমতায় তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদেরকে বসিয়েছে পরিকল্পিতভাবে। যাতে এসব বিধর্মীয় সেবাদাস, স্বার্থান্বেষী ও আরামপ্রিয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করা সহজ হয়।

সব মিলিয়ে ময়দান তাদের অনুকুল ছিলো। হঠাৎ আফগানিস্তানের জিহাদ শুরু হওয়ায় তাদের আশায় পানি পড়ে গেছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা এই প্রতিরোধ আন্দোলন ঠেকাতে। কিন্তু না! আফগানিস্তানের এই জিহাদ মুসলিম উম্মাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে হাজার বছরের পুরানো সেই ভুলে যাওয়া সবক। তাই দিকে দিকে পুন জ্বলে উঠেছে দীন ইসলামের লাল মশাল। মাথায় কাফন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে মুসলিম নওজোয়ানরা তাদের মজলুম মা-বোনদের পাশে। আজকে তারা মুকাবিলা করতে চায় বর্তমানের এই

করুণ বাস্তবতাকে। রুখে দিতে চায় সকল ধরনের চক্রান্তকে। তালিবান, আল-কায়িদা, হামাস, ইসলামী জিহাদ ইত্যাদি সংগঠন উল্লেখিত জানবাজ মুসলিম জোয়ানদের বিভিন্ন কাফেলার নাম।

উম্মাহর প্রত্যেকটি সদস্যের কাছে বিনীত অনুরোধ, অন্তত আপনারা এদেরকে সন্ত্রাসী বলবেন না। ওরা সন্ত্রাসী নয়; ওরা আমাদের বন্ধু; ওরা আল্লাহওয়ালা। ওরা উদ্ধার করতে চায়, মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া সব রকমের স্বাধীনতাকে, ফিরিয়ে আনতে চায় নিজের রক্তের বিনিময়ে হলেও সেই সোনালী অতীতকে। আসুন, আমরাও শরীক হই সেই কাফেলায়। কাফেরদের সকল পরিকল্পনা ও চক্রান্ত আজ ধুলিস্যাত হতে চলছে। বিজয়ী হবে এবার ইসলামী কাফেলাই। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাত্হুন কারীব।

পুরাতন শিকারী নতুন ফাঁদ

ইসলামবিরোধীরা বসে নেই। পুরাতন শিকারী নতুন ফাঁদ পেতে চলেছে অহরহ। তাদের নীতিনির্ধারক ও বুদ্ধিজীবীরা রাতের ঘুমকে হারাম করে দিয়ে ফন্দি এঁটে চলেছে। এক আরব মুজাহিদ নেতার মতে যখন মুসলমানরা নিজ নিজ রুমের বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুতে যায়, তখন তাদের দুশমনরা বাতি জ্বালিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মিটিংয়ে বসে পড়ে। তবে পার্থক্য এতোটুকু যে, এক সময় তো কাফেররা মুসলমানদের কোন প্রকার ছাড় দিতে আদৌ রাজি ছিলো না এবং মুসলমানদেরকে সকল স্বাধীনতাকে শক্তভাবে দাবিয়ে রাখতো। এখন তারা কিছু দিয়ে তুলনামূলক ছোট বিপদ কাঁধে নেয়ার পলিসি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে।

এজন্য দেখুন, তারা ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষকে ফিলিস্তিনের এক অংশ প্লেটে নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করে আসছে বহুদিন যাবত, যাতে হামাসের মতো খালিস ইসলামী আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ থেকে তারা মুক্ত থাকতে পার। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছি, ইনশাআল্লাহ তাদের এই চক্রান্তও পূর্বের সকল চক্রান্তের ন্যায় নাস্তানাবুদ হবে। বরং আমরা ইসরাঈল-ফিলিস্তিন চুক্তির সময় বলেছিলাম, জিহাদে-ফিলিস্তিন সবেমাত্র শুরু

হলো। উল্লেখ্য, অবস্থা এখন এমনই দাঁড়িয়েছে, মুজাহিদীনে কিরামের ভয়ে আজ কাফেররা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার পরিবর্তে নিজেদের আত্মরক্ষার ফিকির করছে।

এখন যেহেতু পৃথিবীব্যাপী উম্মাহর হিফাজত ও নিরাপত্তার বাহ্যিক মাধ্যম এসব মুজাহিদীন, যাদেরকে চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী বলা হচ্ছে, সেহেতু সময় এসেছে জিহাদী সংগঠনগুলোকে খুব মজবুত করার, মুজাহিদীনকে এমন তারবিয়াত দেয়ার, যাতে তাঁরা জিহাদের হক আদায় করতে পারেন, এমন কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করার যদ্দারা জিহাদী কার্যক্রম মজবুত থেকে মজবুততর হয়, এমন আমল থেকে বাঁচার যার দরুন জিহাদ ও মুজাহিদীনে কিরামের বদনাম হয়ে যায়। মুজাহিদীনে কিরামকে সব সময় একথা মনে রাখেতে হবে যে, তাঁরা জিহাদের মাধ্যমে যেমন উম্মাতের হিফাজত করবেন, তেমনি নিজেদের আমল, আখলাক ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও জিহাদের হিফাজত করবেন। অথবা বিষয়টি এভাবেও বলা যেতে পারে যে, ইসলামের মহত্ত্ব ও উম্মাতে মুসলিমার হিফাজতের জন্য জিহাদের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি জিহাদকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ কিছু আমল ও আখলাকের প্রয়োজন রয়েছে।

আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার ও উম্মাতে মুসলিমার হিফাজতের জন্য ইসলামের দুশমনদের সাথে রীতিমতো লড়াই করা, জিহাদের হিফাজতের জন্য নামসর্বস্ব মুসলিম সরকারসমূহ এবং নফস ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করা মুজাহিদীনে কিরামের এমন জিম্মাদারী, যাতে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা বা অবহেলা হলেও গোটা উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। মুজাহিদীনে কিরামকে একথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, জিহাদের এই মহান নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহে পুনরায় পৃথিবীব্যপী চালু করে দিয়েছেন।

জিহাদ সর্বদা জারি আছে এবং সর্বদা তা জারি থাকবে। তবে এবার যে পদ্ধতিতে ও যে অবস্থায় শুরু হয়েছে, এটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও একান্ত দয়া ছাড়া কিছু নয়। আর এবার জিহাদের মেহনত পৃথিবীব্যাপী এমনভাবে চালু হয়েছে যে, পৃথিবীর কোন ক্ষমতা বা শক্তি তা আর রুখতে

পারবে না। তবে হ্যাঁ, জিহাদকে সব ধরনের বদনামী ও দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব সেসব মুজাহিদের উপরই বর্তায়, যাদের আল্লাহ তা'আলা এই বিশাল নেয়ামত ও অনুগ্রহ গ্রহণের সুযোগ ও তাওফীক দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান কে কতটুকু তাঁর দায়িত্ব পালনে আগ্রহী ও মনোযোগী। ইরশাদ হচ্ছে– অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি। (সূরা মুহাম্মদ ৩১)

সশস্ত্র সংগঠনগুলোর জন্য আশংকা

মুজাহিদীনে কিরামের এসব সংগঠনের জন্য সবচে' বেশি আশংকা সেসব সরকারের পক্ষ থেকে রয়েছে, যারা কুফরী শক্তির চক্রান্ত ও ইসলামী দলগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঢিলেঢালা রাজনৈতিক কর্মসূচীর দরুন ক্ষমতার লাগাম কব্জা করতে সক্ষম হয়েছে। পাশ্চাত্যের মানসিক গোলাম ও ইসলামী শিক্ষা এবং আদর্শ-বঞ্চিত এসব সরকার প্রধান ও সরকারী নেতৃবৃন্দ নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে তাদের ইসলামের নামের প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা সর্বদা ইসলামের নামের প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা সর্বদা ইসলাম, ইসলাম জপ্‌তে আদৌ ক্লান্ত হবে না। মাথায় সাদা টুপি লাগাবে এবং লম্বা জুব্বা পরে মসজিদে মসজিদে ও মাজারে চক্কর দিতে থাকবে।

পক্ষান্তরে যদি কোন সময় বিদেশী প্রভুরা তাদের একাজের জন্য চোখ রাঙানিদেয় তাহলে তৎক্ষণাৎ এইসব নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে আধুনিক (?), উদারপন্থী (?) এবং মৌলবাদী না হওয়ার হাজারো প্রমাণ পেশ করবে। প্রয়োজনে মসজিদসমূহে বুলড্রোজার চালাবে, মাদরাসাসমূহকে মিশিয়ে দিবে মটির সাথে, ইসলামী আইনের খোলামেলা সমালোচনাও করবে এবং ইসলামের বিষয়গুলোকে মোল্লা-ইজম ও পশ্চাতমুখী মতবাদ বলে রদ করে দিবে।

এ শতাব্দীর এই মুনাফিক শ্রেণীর ব্যাপারে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ সবসময় আশংকায় থাকে। মুসলমানদের নেতা নামে পরিচিত এসব পাশ্চাত্যের গোলামদের মুখের কাছে মদ ও মদ জাতীয় দ্রব্য অপরিচিত নয়।

তাদের বিভিন্ন ধরনের সম্পদ পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। তারা ছুটির সময়গুলো এমন স্থানে কাটায় যেখানে শয়তানেরা বিবস্ত্র নৃত্য করে, যেখানে অশ্লীলতা সংস্কৃতি নামে পরিচিত। শিক্ষিত নামের এসব অশিক্ষিতরা তাদের প্রভুদের বুদ্ধিতে চলে। এদের মুখসমূহ সত্য কথা থেকে বঞ্চিত। ওরা যেন এমন যেভাবে ইচ্ছা, তাদেরকে চালাতে পারে, যা বলাতে চায় বলাতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশ সরকার প্রধান ও সরকারী নেতৃবৃন্দকে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় বিশ্বাস করা যায় না।

এজন্য মুজাহিদীনে কিরাম প্রয়োজন মনে করলে জরুরতের সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তাদের থেকে বিভিন্ন নিতে পারেন, কিন্তু কস্মিনকালেও তাদের উপর আস্থা রাখা যাবে না। যদি কখনো কোন ভুল মুজাহিদ করে ফেলে, তা হলে তার মাসুল দিতে হবে কড়ায় গণ্ডায়। এসব নেতৃবৃন্দের সাথে বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা কোনটিই ইসলামী আন্দোলনের কল্যাণ বয়ে আনবে না। নিজেদের বন্ধুকে ঢেকুর নেয়া ছাড়াই গিলে ফেলা এসব নেতৃবৃন্দের চিরাচরিত অভ্যাস।

এ বিষয়টির দিকে যথাযথ নজর রেখে ছোট বড় সব ধরনের ইসলামী সংগঠনের এমন পদক্ষেপ রাখা চাই, যদ্বারা উল্লেখিত নেতৃবৃন্দের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। যদি ক্ষমতাসীনরা তাদের প্রভুদের ইশারায় সংগঠনসমূহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায় কিংবা তাদের কার্যক্রম একেবারে বন্ধ করে দিতে চায়, তাহলে জিহাদী সংগঠনসমূহের কাছে পূর্ব থেকে এমন পদক্ষেপ থাকা চাই, যার দরুন একদিনের জন্যও কাজ বন্ধ রাখতে না হয়।

সেই পদক্ষেপটা কি? কি হবে তার পলিসি? না; সেটা আমরা নির্দিষ্ট করে বলবো না। বিষয়টি আমরা তাদের উপর ছেড়ে দিলাম, যাঁদের কাঁধে উল্লেখিত সংগঠনসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে। তারা সবাই বসে কিভাবে কি করা যায়, তা নির্ধারণ করে নিবেন। আর বিষয়টি অন্যান্য বিষয়ের আগে রেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবেন। কেননা যে কোন সময় যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, সম্ভাবনা ও আশংকাকে কখনোই ছোট করে দেখা উচিত নয়।

যেহেতু প্রত্যেক এলাকা ও প্রত্যেক সংগঠনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও হালত হয় এবং এ ধরনের বিষয় লিখিত আকারে না আসাই ভালো, এজন্য বিশেষ পদক্ষেপগুলো লেখা সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের দিকে ইংগিত করা লাভজনক হতে পারে।

১. যে ডালে শিশির বিন্দু রয়েছে সেই ডালটি না কাটা চাই। (অর্থাৎ, জিহাদী সংগঠনের লোকেরা যে দেশের বাসিন্দা সেই দেশে জিহাদী কার্যক্রম তথা অপারেশন না করা চাই।) এজন্য জিহাদী সংগঠনগুলো তাদের সামরিক কার্যক্রম শুধু জিহাদের ময়দানে সীমিত রাখা চাই। নিজেদের ইসলামী রাষ্ট্রে সামরিক কার্যক্রম চালানো চাই না। অন্যথায় সরকারের সাথে সরাসরি টক্কর হতে পারে। আর এমনটি হলে কাফিররাই কেবল লাভবান হবে, নিজেদের কোন ফায়দা হবে না।

২. এ অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে দীনী রাজনৈতিক দলসমূহ, দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ইতিবাচক পন্থায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মানে ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যেতে পারবেন। এমন অবস্থায় জিহাদী সংগঠনসমূহ ব্যক্তি গঠন, তারবিয়াত, জিহাদী দাওয়াত ইত্যাদি কাজ করে যাবে। আর সমরিক কার্যক্রম শুধু জিহাদের ময়দানে সীমাবদ্ধ রাখবে। নিজের দেশে সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে।

হ্যাঁ, যখন দীনী রাজনৈতিক দলসমূহ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও বিদগ্ধ উলামা-মাশায়িখ ইসলামী সমাজ বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পন্থার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়বেন এবং শান্তিপূর্ণ পথ পরিহার করে জিহাদের পথ অবলম্বন করবেন, তখনকারে প্রেক্ষাপট কিন্তু ভিন্ন হবে। আশা করি আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশ এমন অবস্থায় কখনো পৌছবে না।

মুজাহিদদের সাংগঠনিক পদ্ধতিগত কিছু কথা

মুজাহিদদের দুনিয়ামুখী না হওয়া। অধিক শান-শওকত ইত্যাদিতে না পড়া। সকল শাখার সাথীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা চাই। সামরিক

শাখা ছাড়া যারা অন্যান্য শাখায় কাজ করেন, তাদের উচিত মাঝে মধ্যে ময়দানে গিয়ে এক চিল্লা, দুই চিল্লা সময় লাগানো। এতে করে দুনিয়ার মহব্বত কমবে এবং মৃত্যুর স্মরণ হবে।

আর যেখানে ময়দান নেই কিংবা ময়দানে যাওয়া সহজ নয়, তাহলে সেখানে অন্যান্য শাখার সাথীরা নতুন নতুন ট্রেনিং গ্রহণ করবে, যাতে পরিশ্রমের কাজ করে মন-মানসিকতা ফ্রেশ হয়। এতে করে একটি ফায়দা এই হবে যে, সব শাখার সাথীরা সবাইকে চিনবে এবং কেউ মনে করতে পারবে না যে, আমি ছাড়া এই শাখা অচল।

জিহাদী সংগঠনগুলোর জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা

আজকাল দীনী সংগঠনগুলোর মধ্যে দু'ধরনের পদ্ধতি দেখা যায়। একটি তো রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি। এতে প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিরই প্রভাবটা তথা সিস্টেমটাই বেশি। এতে রাজনৈতিক দলগুলোর মূলনীতি, পদ্ধতি ও পরিভাষাসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, একটি সংগঠনেরই লোক হয়ে নিজেদের দলীয় পদের জন্য রীতিমতো একজন আরেকজনের বিপরীতে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। বড় পদগুলো গ্রহণের জন্য তারা পরস্পরে যথারীতি নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। এ পদ্ধতিতে কখনো অস্থায়ী কমিটি আবার কখনো স্থায়ী কমিটি করা হয়।

এ পদ্ধতিতে আমীর বা অন্য কোন পদস্থ নেতা স্থায়ী হন না। বরং তাকে একটি মেয়াদের জন্য নির্বাচিত করা হয়। অতঃপর সে মেয়াদ শেষ হলে তাকে পুনরায় নির্বাচন করতে হয়। বারবার পারস্পরিক ও অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের ফলে এক ব্যক্তির একাধিকবার দীর্ঘদিন একসাথে একই পদে থাকা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

এখানে এই ভোটাভুটি পদ্ধতির দরুন তৃণমূল পর্যায় থেকে নিয়ে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত অন্তত একটি বিরোধী দল থাকে, এরা সব সময় তাদের পছন্দের প্রার্থীকে জেতাতে ও তুলনামূলক অপছন্দের ব্যক্তিকে হারাতে তৎপর থাকে।

আমরা এই ব্যবস্থার সমালোচনা করছি না। কেননা যেসব মুখলিস ব্যক্তিবর্গ এসব নিয়মনীতি তৈরি করেছেন এঁরা অবশ্যই এতে বিশেষ কোন ফায়দা দেখেছেন। তাই তাঁরা এটি অবলম্বন করে চলেছেন।

অপর কিছু দীনী সংগঠন একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেমন তাবলীগী জামাআত। এটি বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর সবচে' বড় সবচে' বেশি মকবুল ও সবচে' বেশি কার্যকরী জামাআত হিসাবে নিজের অবস্থান মজবুত করে নিয়েছে।

এই জামাআতে আমীর ছাড়া আর কোন পদ নেই। আর আমীর নির্বাচনের জন্য কোন ধরনের ইলেকশনের ব্যবস্থা নেই। এ জামাআতে প্রচার-প্রসারের জন্য কেবলমাত্র মৌখিক মাধ্যমকেই কাজে লাগানো হয়। এরা না কোন পোস্টার ছাপায় না কোন হ্যান্ডবিল। এদের না কোন মাসিক পত্রিকা আছে, না সাপ্তাহিক ও দৈনিক। আমীরের ফায়সালাই এখানে চূড়ান্ত। আর আমীর কারো সাথে পরামর্শ করার কিংবা কারো রায় নিতে বাধ্য নন। এ ধরনের আ-মৃত্যু নির্বাচিত হন।

জিহাদী সংগঠনগুলোর জন্য এ দুটি পদ্ধতির কোনটিই হুবহু নেয়া সম্ভব নয়। কেননা খালেস রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যাতে ভিতরে বাইরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকে। মুজাহিদদের জন্য তেমন তৎপরতা চালানো সম্ভব নয়। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর মতো এতো ব্যাপকভাবে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালানো তাদের পক্ষে মুশকিল। আর তা এজন্য সম্ভব নয় যে, তারা সব সময় কোন না কোন মুজাহিদ (রণাঙ্গনে) দুশমনদের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ চালাতে থাকে, সাথীদের খানা-রসদ ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি সরবরাহে থাকে খুব ব্যস্ত। সাথে দুশমনদের ব্যাপারে সতর্ক থেকে নিজেদের হিফাজতও করতে হয়। আহত সাথীদের সেবা-শুশ্রূষা ও শহীদ সাথীদের সার্বিক বিষয়াদির সমাধান করতে হয়। করতে হয় জয়-পরাজয়ের মুশকিল সমস্যার সমাধান।

মুজাহিদদের ব্যস্ততার শেষ নেই। যে দেশে মুজাহিদদের মাছাজ আছে, সেখানে সাথীদের ট্রেনিং দেয়া, ময়দানে পাঠানো ইত্যাদি অনেক কাজ থাকে। মোটকথা, একজন মুজাহিদ আর দু'চারটা রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীর মতো ঘরে বসে থাকতে পারে না।

এ জন্যই তো মুজাহিদদের নেতৃবৃন্দকে সারা জিন্দেগী ওয়াক্ফ করতে হয় এবং তাদেরকে মাসকে মাস বছরকে বছর বাড়ি থেকে দূরে থাকতে

হয়। এমতাবস্থায় যদি তারা সর্বদা আমীর পরিবর্তন করতে থাকে এবং সাংগঠনিক অবকাঠামো পাল্টাতে থাকে, তাহলে এতে তাদের আসল কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। উপরন্তু উল্লেখিত রাজনৈতিক দলের মতো যদি মুজাহিদদের সংগঠনে নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হয়, তাহলে সর্বস্তরে লবিং-গ্রুপিং শুরু হয়ে যাবে এবং এতে নষ্ট হবে ঐক্য। অথচ জিহাদী সংগঠনগুলোতে ঐ সাথীদের মাঝে ঐক্য ও পারস্পরিক হৃদ্যতা প্রথম ও প্রধান বিষয়। অন্যথায় শুত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় সাধন করা কঠিন।

উপরন্তু জিহাদ নামাযের মতোই একটি ফরীযা ও মহান ইবাদত। আর ইবাদতের মধ্যে তুমি, তুমি; আমি, আমি, চলে না; চলে না এখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, একজন আরেকজনকে পরাজিত করার প্রতিযোগিতাও নেই এখানে। নেই একজনকে উপরে উঠানো ও আরেকজনকে নীচে নামানোর ঘটনা।

আভ্যন্তরীণ নির্বাচনে অনেক সময় অনৈক্যের সৃষ্টি হয় একজন অপরজনের উপর বিভিন্ন ধরনের অপবাদ দেয়ার ঘটনা ঘটে, ভিতরে ভিতরে দল উপদলের সৃষ্টি হয়, জিহাদী সংগঠনগুলোতে এমন হলে যুদ্ধরত আল্লাহর সেনারা বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়। এতে ক্ষতি হবে অপূরণীয়, জিহাদের প্রাণ সামরিক শক্তিতে পড়বে ভাটা এবং জিহাদ শিকার হবে ঘৃণ্য দলাদলির রাজনীতির, বন্দুকের নল ব্যবহার হতে থাকবে ব্যক্তিস্বার্থে– যা হবে নির্ঘাত আত্মঘাতী বিষয়।

এজন্য মুজাহিদদেরকে এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের জন্য প্রচলিত রাজনীতির দরজা বন্ধ রাখতে হবে। কেননা এই প্রচলিত রাজনীতি যদি কাফিরদের জন্য ক্ষতিকর ও মুসলমানদের জন্য লাভজনক হতো তাহলে কাফির গোষ্ঠী সকল জিহাদী ময়দানে মুজাহিদদেরকে জিহাদী-পন্থা ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিতো না।

শত্রুদের বারবার রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বনের প্রতি পীড়াপীড়ি করতে দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন যথেষ্ট নয়। কাফিরদের জিহাদ ছেড়ে দেয়ার

আহ্বানে একথাও বুঝা যায় যে, এই জিহাদী কার্যক্রম তাদের কোমর ভেদে দিতে সক্ষম। এজন্য তারা এর প্রতি এত ভীত ও সন্ত্রস্ত। তাই তারা মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক ধুম্রজালে আবদ্ধ করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়।

মনে রাখবেন, জিহাদের ময়দানে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। আর আলোচনার টেবিলে কাফির গোষ্ঠী সব সময় চক্রান্ত বাস্তবায়নে তৎপর থাকে। হ্যাঁ, আলোচনার পিছনে মুসলমানদের পক্ষে প্রচণ্ড সামরিক চাপ থাকে তাহলে তা কৃতকার্য ও লাভজনক হতে পারে।

জিহাদী সংগঠনগুলোর নিজেদের গঠনতন্ত্র কর্ম-পদ্ধতি ও কর্মসূচী তৈরি করার সময় অবশ্যই এর দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে, তারা এমন একটি সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর– যাতে তারা কেবল তখনই কৃতকার্য হতে পারবে, যখন তারা সব ধরনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মত বিরোধ থেকে মুক্ত থাকবে। এজন্য নিজেদের সাথীদের মধ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য থাকতে হবে। কোন মতেই মত বিরোধ ও দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেয়া যাবে না।

মুজাহিদীনে কিরামকে একথা উপেক্ষা করলে চলবে না যে, তাদের দুশমন কাফির গোষ্ঠী খুবই ধূর্ত কপট কুচক্রী; এসব কুচক্রী শক্তি সব ধরনের মৌলিক মত বিরোধ ভুলে গিয়ে আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ হয়েছে। এজন্য মুজাহিদদেরকে খুব সতর্কতার সাথে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অন্যথায় কাফিরদের অন্তর থেকে তাদের ভীতি ও প্রভাব চলে যাবে। পরিণতিতে কাফিররা মুসলমানদের ব্যাপারে হয়ে পড়বে আগের তুলনায় আরো বেপরোয়া ও উগ্র।

এজন্য জরুরী হলো, জিহাদী সংগঠনগুলোর পরিচালনার এমন নিয়ম-নীতি তৈরি করা যাতে কোন মতে প্রচলিত রাজনীতির নেতৃত্বের চড়ায় উৎরাই না থাকে, না থাকে সেখানে নেতৃত্ব নিয়ে কামড়া-কামড়ি। সেখানে নির্বাচনের মানদণ্ড যেন থাকে ইখলাস, লিল্লাহিয়াত, কুরবানী ও ত্যাগের জযবা, নিরলস পরিশ্রম ও দুনিয়াবিমুখতা। আর কখনো যেন এসব পদকে

আকর্ষণীয় করে রাখা না হয়। খোদা নাখাস্তা, যদি কখনো কারো মনে এসব পদের মোহ এসে যায়, খুলে যায় পারস্পরিক দ্বন্দ্বের দরজা, শুরু হয়ে যায় নির্বাচন পদ্ধতির মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, তাহলে এসব ইসলামী সামরিক সংগঠনগুলোর জন্য হবে তা আত্মঘাতী ও জীবননাশক।

গঠনতন্ত্র তৈরির সময় প্রত্যেকটি ধারা-উপধারাকে এই নিত্তির উপর মাপা চাই যে, জিহাদ একটি ইবাদত; তাই সকল কানুন হবে উক্ত ইবাদতের জন্য পূর্ণতা- দানকারী। এতে সকল কানুসের ভিত্তি হবে আনুগত্য ও ত্যাগ। সকল সাথী এসব আইন-কানুন মেনে আরো নীতিনিষ্ঠ ও অনুগত এবং ত্যাগী হয়ে উঠবে; প্রচলিত রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মতো হটধর্মী, জেদী ও স্বার্থপূজারী হবে না। সবাই যেন হয়ে উঠবে আনুগত্যের এক একজন মূর্ত প্রতীক।

এজন্য এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো, জিহাদী সংগঠনগুলোতে লোক নেয়ার সময় এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করার খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা। তবে একথা ঠিক যে, জিহাদ সকল মুসলমানকেই করতে হবে, প্রত্যেকেই জিহাদী সংগঠনে শরীক হওয়ার সুযোগ করে দেয়া চাই। তারপরও জিহাদী সংগঠনগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তা টিকিয়ে রাখতে হলে উল্লেখিত পদ্ধতির বিকল্প নেই।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই। আর তা হলো– একটি হচ্ছে জিহাদে শরীক হওয়া। আর আরেকটি হচ্ছে জিহাদী সংগঠনে শরীক হওয়া। অল্প কিছু শর্তসাপেক্ষে যে কোন মুসলমান জিহাদে শরীক হতে পারবে। কিন্তু জিহাদী সংগঠনে শরীক হতে হলে কিংবা কোন জিম্মাদার হতে হলে তার জন্য থাকবে বিশেষ কিছু নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী, যা কেবল উক্ত জিহাদী সংগঠনের ও ইসলামের স্বার্থেই তৈরি করা হবে। প্রচলিত রাজনৈতিক মানসিকতা পোষণ কারী, প্রচারপ্রিয় ও কোন রিয়াকার ব্যক্তিকে এ সংগঠনে স্থান না দেয়া চাই।

এ জমানায় জিহাদের কবুলিয়াত খুব দ্রুত বেড়ে চলেছে। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে এতে আরো অনেক মুসলমান শরীক হবে। এজন্য আশংকা হচ্ছে যে, কিছু প্রসিদ্ধিপ্রিয় লোক ও কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এতে ঢুকে পড়ে

কিনা! এমনটি হলে তা হবে উম্মাহর জন্য বিরাট পরাজয়। এতে মুজাহিদদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা কমে যাবে, আন্তরিক প্রশান্তি কমে যায়। এছাড়াও সৃষ্টি হবে সমূহ সমস্যা। এসব বিষাক্ত বস্তু মুজাহিদীনে কিরামকে প্রকৃত দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে বেকার বানিয়ে ফেলবে। মুজাহিদদের সময় প্রকৃত মাঠে ব্যয়ের পরিবর্তে সংগঠন গোছানোর ও সাথীদেরকে যুগানোর পিছনেই শেষ হয়ে যাবে। অপর দিকে এ সুযোগটা গ্রহণ করবে দুশমনরা।

এজন্য সংগঠনের মৌলিক স্থানগুলোতে এবং স্পর্শকাতর পদগুলোতে এমন লোকদেরকে বসাতে হবে যারা জিহাদের ময়দানে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করেছেন, দুশমনের গুলি ও জঙ্গী বিমানের দুরুম-দারুম আওয়াজ শুনেছেন, শাহাদাতের তামান্নায় যারা আপ্লুত, প্রসিদ্ধি ও সম্পদের প্রতি যারা আদৌ আকৃষ্ট নন। এমন ঘৃণা পোষণ করেন যেমন, ঘৃণা শূকরের গোশতের প্রতি করা হয়। তাকওয়া পরহেযগারীতে যারা প্রসিদ্ধ, কুরবানী ও ত্যাগের ব্যাপারে যারা দৃষ্টান্ত ও নেতৃত্বের চেয়ার থেকে নেমে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে সাধারণ মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাফিরদের মুকাবেলায় লড়াই করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ করেন না।

আলহামদুলিল্লাহ! এমন অসংখ্য লোক রয়েছেন কিন্তু তারা নীরব ও নিভৃতচারী বিধায় তাদের কদর করা হয় না; অথচ নেতৃত্বে এদেরই বেশি প্রয়োজন, এদের নেতৃত্বে সংগঠন নূরানী ও প্রানবন্ত হয়ে উঠতে পারে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক মানসিকতার লোকেরা বাহ্যিক যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতা দেখিয়ে মুজাহিদীনে কিরামের কাতারে শামিল হয়ে বিশেষ বিশেষ স্থান দখল করে তাদের মিশনের সমুহ ক্ষতি করে ফেলে।

হ্যাঁ, এদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে যে, যদি কোন সিক্তহস্ত রাজনীতিবিদ মুজাহিদদের সাথে একা হয়ে কাজ করতে চান, তাহলে তাকে স্বাগত জানাতে হবে। সাথে সাথে প্রথমে তাকে মজবুতভাবে তালীম-তারবিয়াত দিতে হবে এরপর তাকে বলতে হবে, "উম্মাহর উপর বর্তমান নির্যাতন ও জুলুমের পরিপ্রেক্ষিতে কোন মুসলমানের জন্য এই মুহূর্ত কোন অবস্থাতেই এটা জায়িয হবে না যে, সে ইজ্জত, সম্মান, পদমর্যাদা ও

প্রসিদ্ধির পিছে পড়বে। বরং এখন সময় তো কুরবানী করার, এখন প্রয়োজন আল্লাহর রাহে জান কুরবান করে উম্মাহকে রক্ষা করা। এখন জিহাদ থেকে কিছু নেয়ার নেই; বরং এখন পথ খোলা শুধু দেয়ার। এ পথে আজ সময়, ইজ্জত, পেশা তথা সর্বস্ব বিলীন করতে হবে, তাহলে হয়তো রক্ষা পাবে উম্মাহ, আদায় হবে আমাদের প্রতি তাদের হক।"

যখন তিনি সন্তোষজনকভাবে সঠিক তালীম-তরবিয়াত গ্রহণ করবেন, হৃদয়াঙ্গম করবেন উল্লেখিত কথাগুলো, বুঝতে সক্ষম হবেন এ উম্মাহর বর্তমান অবস্থা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মতবিরোধ গীবত, সেকায়েত ইত্যাদিকে অন্তর থেকে ঘৃণা করবেন তখন তার পুরানো ও নতুন অভিজ্ঞতার দরুন তাকে কাজ করার সুযোগ দেয়া উচিত।

তাবলীগী জামাআতের নিয়ম-কানুনও জিহাদী সংগঠনের জন্য হুবহু অনুস্মরণ করা সম্ভব নয়। কারণ শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে নানা রকম মাধ্যম ও আসবাব অবলম্বন করতে হয়। আর আল্লাহ তাআলাও এমনটি নির্দেশ করেছেন যে, সাধ্যমত আসবাব সংগ্রহ করো সাথে সাথে প্রস্তুতিও গ্রহণ করো যথাযথভাবে।

এসব আসবাবের মধ্যে প্রচার মাধ্যমও শামিল। মুজাহিদদের প্রচার-প্রসারের প্রয়াজন হয়। জিহাদের ব্যাপারে উম্মাহর মধ্যে যে জড়তা এসে পড়ছে তা দূর করার জন্য মাহফিল ইশতেহার, পুস্তক প্রকাশ ও ক্যাসেট ইত্যাদি প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে। আরো বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের প্রচার-প্রসার করা দরকার। কারণ আজকের দুশমনরা ময়দানের তুলনায় প্রচার মাধ্যমে আক্রমণ চালাচ্ছে বেশি। এজন্য শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে সব রকমের প্রচার-প্রসার করা মুজাহিদদের জন্য জরুরী হয়ে পড়ছে।

তাবলীগী জামাআতের মতো জিহাদী সংগঠনগুলো নিজেদের দলের রাজনীতিতে বেগানা থাকতে পারে না। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাদেরকে দেশের রাজনৈতিক পলিসি, পটপরিবর্তন ইত্যাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। এমনকি কখনো ইসলাম মুসলমান ও দেশের স্বার্থে স্বল্প পরিসরে কৃতকার্য হস্তক্ষেপও করতে হয়।

এ দুটি বিষয় সামনে রেখে (যথা- জিহাদী সংগঠনগুলোর জন্য না প্রচলিত রাজনৈতিক রীতি হুবহু অবলম্বন সম্ভব, না প্রচলিত তাবলীগী জামাআতের রীতি হুবহু অবলম্বন সম্ভব) জিহাদী সংগঠনগুলোর উচিত, দীনী রাজনৈতিক দলগুলো ও তাবলীগ জামাআতের নিয়ম নীতি সামনে রেখে নিজেদের জিহাদী কর্মকান্ডের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের গঠনতন্ত্র তৈরি করে নেয়া। এতে দীনি রাজনৈতিক দলগুলোর ভালো দিকগুলো যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে তাবলীগী জামাআতের অনুস্মণীয় বিষয়গুলোও। এতে যেমন থাকবে প্রচার মধ্যেমের ব্যবহার তেমনি থাকবে ইখলাস, ইবাদতী রূহ, বিনাবাক্য অনুসরণের ণুরানী পদ্ধতি, থাকবে না পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অনর্থক তর্ক-বিতর্ক, থাকবে নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ মেহনতসহ সকল ভালো দিক।

ঐসব কানুন শুধু কাগজে কলমে নয়, বরং সাধারণ সাথী থেকে নিয়ে নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত থাকবে এর সফল বাস্তবায়ন। আর এমনটি হলে সেই সুদিন অতি দ্রুত আমাদের সামনে এসে যাবে, যার প্রয়োজন উম্মাহ অনেক দিন যাবত প্রবলভাবে অনুভব করে আসছে।

এতো গেলো জিহাদী সংগঠনের গঠনতন্ত্র তৈরির বিষয়। এরপর রয়েছে এসব সংগঠনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার জন্য নিয়ম-নীতি তৈরি করনা যেগুলোর অনুসরণের মাধ্যমে সেসব শাখা-প্রশাখার উত্তরাত্তর তরক্কি হবে এবং সর্বোপরি উন্নতি সাধিত হবে মূল সংগঠনের। এখন সেসব বিষয়ের আলোচনা তুলে এরা হচ্ছে।
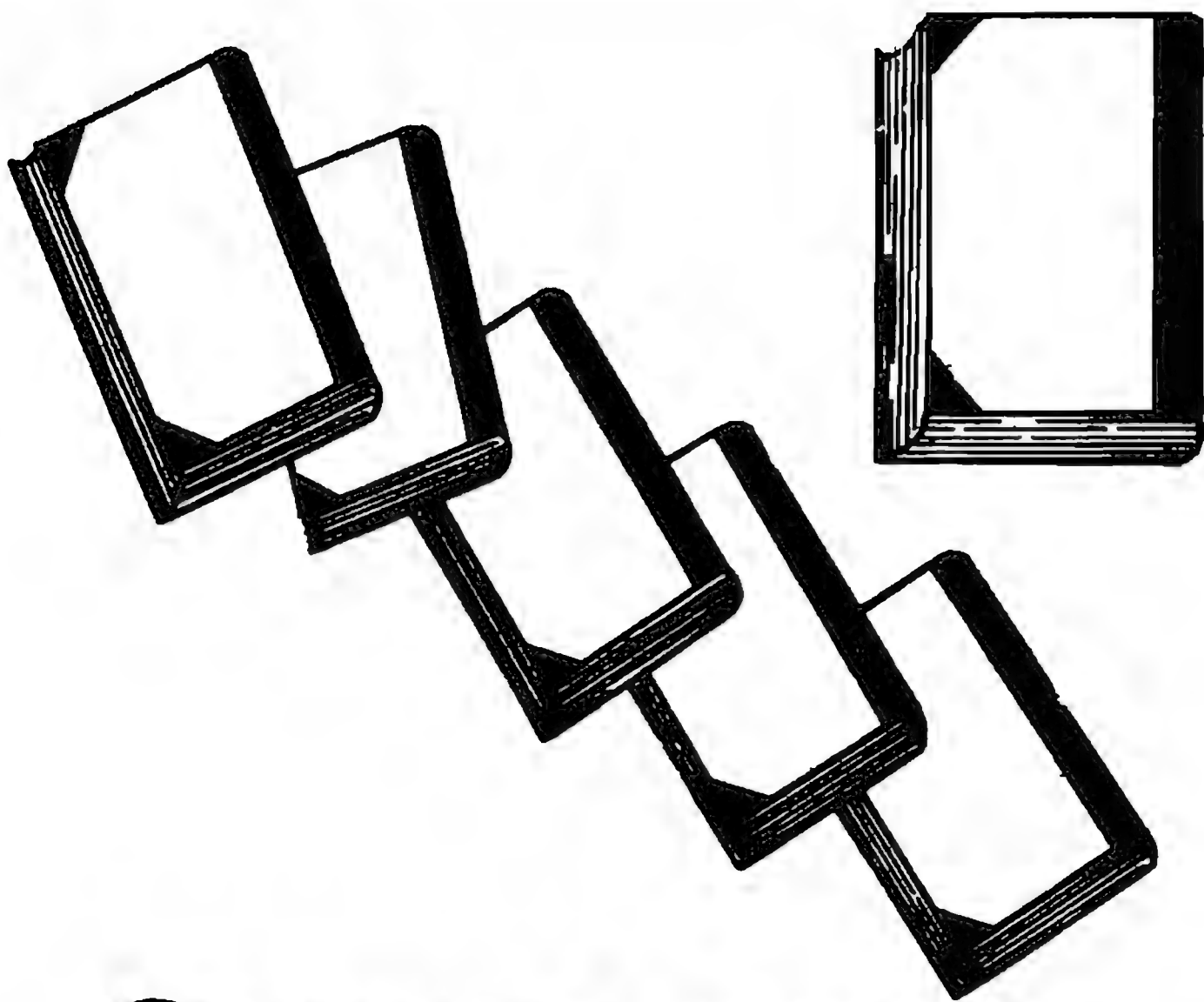
জিহাদের দাওয়াত

ও

প্রচারনা বিভাগ

দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ

দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার এমন একটি অধ্যায়, যার মাধ্যমে কোন সংগঠন বা দলের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও টার্গেট সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এ অধ্যায়ের মাধ্যমে কোন আন্দোলনে নতুন সাথী আসে। এই অধ্যায়ের মাধ্যমে তারা কোন সংগঠনের মেজাজ ও মানসিকতার পরিচয় পায়। উলামায়ে উম্মাত এই শাখার মাধ্যমে কোন সংগঠনের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি যাচাই করে তার হক্কানিয়াতের জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তাঁরা সেই সংগঠনের ব্যাপারে মতামত পেশ করেন।

এজন্য জিহাদী সংগঠনগুলোর জিম্মাদারদের জন্য জরুরী হলো এই শাখার ব্যাপারে খুব যত্নবান হওয়া। এটাকে সাময়িক প্রচার-প্রসারের মাধ্যম মনে না করে মজবুতভাবে গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক ও সামরিক শাখার চাইতে এর গুরুত্ব কোনক্রমেই কম নয়। বরং এই শাখার ছাপ সকল শাখাতেই পড়ে। এই শাখার প্রচার-প্রসার দেখেই লোকজন এদিকে অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক উভয় দিক দিয়ে ধাবিত হয়। এজন্য এ শাখার পরিচালনায় দক্ষ লোক থাকা চাই। এদের মধ্যে থাকা চাই উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু গুণ। বিশেষত নিম্নোক্ত তিনটি গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। যথা ১. গভীর ইলম। ২. তাকওয়া ও ইত্তিবায়ে সুন্নাত। ৩. সামরিক অভিজ্ঞতা।

দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ

দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার এমন একটি অধ্যায়, যার মাধ্যমে কোন সংগঠন বা দলের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও টার্গেট সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এ অধ্যায়ের মাধ্যমে কোন আন্দোলনে নতুন সাথী আসে। এই অধ্যায়ের মাধ্যমে তারা কোন সংগঠনের মেজাজ ও মানসিকতার পরিচয় পায়। উলামায়ে উম্মাত এই শাখার মাধ্যমে কোন সংগঠনের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি যাচাই করে তার হক্কানিয়াতের জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তাঁরা সেই সংগঠনের ব্যাপারে মতামত পেশ করেন।

এজন্য জিহাদী সংগঠনগুলোর জিম্মাদারদের জন্য জরুরী হলো এই শাখার ব্যাপারে খুব যত্নবান হওয়া। এটাকে সাময়িক প্রচার-প্রসারের মাধ্যম মনে না করে মজবুতভাবে গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক ও সামরিক শাখার চাইতে এর গুরুত্ব কোনক্রমেই কম নয়। বরং এই শাখার ছাপ সকল শাখাতেই পড়ে। এই শাখার প্রচার-প্রসার দেখেই লোকজন এদিকে অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক উভয় দিক দিয়ে ধাবিত হয়। এজন্য এ শাখার পরিচালনায় দক্ষ লোক থাকা চাই। এদের মধ্যে থাকা চাই উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু গুণ। বিশেষত নিম্নোক্ত তিনটি গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। যথা ১. গভীর ইলম। ২. তাকওয়া ও ইত্তিবায়ে সুন্নাত। ৩. সামরিক অভিজ্ঞতা।

গভীর ইলম

গভীর ইলম থাকলে একজন দায়ী (প্রচারক) কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক নির্ভুল তথ্য ও সালফে সালেহীনের সহীহ মত ও পথের প্রচার-প্রসার করতে সক্ষম হবে। যা কিছু তিনি বয়ান করবেন তা তথ্যনির্ভর হবে, শুধু জযবা বা যৌক্তিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে না। যেহেতু পুরো সংগঠনের প্রকৃত রূপরেখা এই শাখার নেতা-কর্মীরা মানুষের সামনে পেশ করতেন, এজন্য

আহলে-ইলম তথা গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিকেই এই শাখার দায়িত্ব দিতে হবে– যাতে লোকেরা তাদের বয়ান ও লেখার মাধ্যমে যথাযথভাবে লাভবান হতে পারে, আস্থার সাথে আসতে পারে জিহাদের মতো ইসলামের এই মহান ইবাদতের ময়দানে, সাথে সাথে উলামায়ে কিরামও যেন রাখতে পারেন পূর্ণ আস্থা। হ্যাঁ, উলামায়ে কিরামের তত্ত্বাবধানে সাধারণ শিক্ষিত লোকও এই শাখায় কাজ করতে পারবেন।

তাকওয়া ও ইত্তিবায়ে সুন্নাত

এ শাখার লোকদেরকে সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে হয়, যেতে হয় উলামায়ে কিরামের খিদমতে, উঠাবসা করতে হয় সর্বস্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে। এদের আচার-আচরণের উপর ধারণা নেয়া হয় পুরা সংগঠনের। এজন্য এ শাখায় এমন মুত্তাকী পরহেযগার লোক থাকা চাই যাদেরকে মনে হয় সত্যি সত্যিই এটি মুজাহিদীনে কিরামের জামাআত অবশ্যই এরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়িমে আগ্রহী এবং সক্ষমও। যদি খোদা নাখাস্তা আমলী, মুত্তাকী পরহেযগার ও দীনদার লোকের পরিবর্তে এ শাখায় বে-আমল ও বে-শরা লোককে এ বিভাগে রাখা হয়, তাহলে লোকেরা ভাববে যে, এরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের উপর আমল করে না এরা কীভাবে দীন প্রতিষ্ঠা করবেন? যারা নিজেদের পাঁচ ফুট শরীরে ইসলাম কায়িম করতে পারেনি। তারা কিভাবে পৃথিবীতে ইসলাম কায়িম করবে? যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পক্ষে মুখে দাড়ি রাখতে পারে না। টাখনুর উপর পায়জামা পরতে সক্ষম নয়, তারা কোন মুখে দীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গের দাবী করে? যখন এ সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের অবস্থা এই, তো তাদের সাধারণ সাথীদের অবস্থা কি হবে?

আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিছু কিছু জিহাদী সংগঠন তাদের ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে এক একটি মুস্তাহাবের ও ইহতিমাম করায়, তাকবীরে উলার সাথে নামায না পড়লে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে, যুদ্ধের ময়দানেও তাহাজ্জুদের ইহতিমাম করায় অথচ উক্ত সংগঠনগুলোর মুবাল্লিগ (প্রচারক) মুসান্নিফ (লেখক)বৃন্দ যারা উলামায়ে কিরাম ও জনসাধারণের মুখোমুখি

হচ্ছেন যাদের জন্য সুন্নাত-মুস্তাহাবের ইত্যাবা মানা সহজ তারা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতসমূহ মানছেন এবং জরুরী আমলগুলো ছেড়ে দিচ্ছেন।

বিষয়টি কারো কাছে ছোট হলেও এতে জিহাদ ও মুজাহিদীনে কিরামের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। আর নেতৃত্বদানকারী উলামায়ে কিরামের মনও এতে ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর্থিক জোগান তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। এজন্য সংগঠনগুলো মাহাজের মধ্যে তাহাজ্জুদ ও সুন্নাত, মুস্তাহাবের যেমনটি খেয়াল রাখেন অফিস ও অন্যান্য সময়ও এর খেয়াল রাখবেন বলে হিতাকাঙ্ক্ষীদের প্রত্যাশা। মুসান্নিফীন ও মুবাল্লিগীনদেরও এ ব্যাপারে খুব যত্নবান হওয়া দরকার।

সামরিক অভিজ্ঞতা

জিহাদী সংগঠনসমূহের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার শাখায় কর্মরত ব্যক্তিদের ইলম, তাকওয়া, সুন্নাতের ইত্তিবার সাথে সাথে সামরিক অভিজ্ঞতা ও শারীরিক তরবিয়াত থাকা চাই। উত্তম তো এই ছিলো যে, তারা এমন ব্যক্তি হবেন যারা জিহাদের ময়দানে একাধিকবার মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছেন। এতোটুকু না হলে অন্তত কোন মহাজে বেশ কিছুদিন কাটীয়েছেন এবং সব ধরনের তরবিয়াত নিয়েছেন। কেননা জিহাদকে যথাযথভাবে বয়ান করার জন্য ইলমের সাথে সাথে পর্যাপ্ত ইলমের অভিজ্ঞতাও দরকার।

জিহাদ একটি আমলী (বাস্তব) ইবাদত। এটা শুধু কিতাবী নির্দেশ নয়। অধম গ্রন্থকারের মতে জিহাদ এমন একটি ইবাদত যা শুধু অধ্যয়ন করে বুঝা সম্ভব নয় বরং এর জন্য চাই বাস্তব অভিজ্ঞতা। কারণ এতে ইলমী দিকের চাইতে আমলী দিকটার অংশ বেশির। তাই জিহাদ বুঝতে বাস্তব আমলে বিকল্প নেই।

যদিও কিতর পড়ে জিহাদ সম্পর্কে কিছু লেখা বা কিছু বয়ান করা অসম্ভব নয়; কিন্তু জিহাদের বাস্তব স্বাদ হাকীকত বয়ান করার জন্য চাই বাস্তব অভিজ্ঞতা। এজন্য মুবাল্লিগ ও মুসান্নিফদেরকে জিহাদের ময়দানের সুগন্ধিময় ও নূরানী চেহারা দেখতে হবে, শুনতে হবে গোলাগুলি ও জঙ্গী বিমানে আওয়াজ। তাহলেই তারা প্রাণবন্ত বয়ান দিতে ও হৃদয়গ্রাহী পুস্তক রচনা করতে সক্ষম হবেন।

হ্যাঁ, যখন বক্তা ও লেখক কুরআন-সুন্নাহর ইলম ও অভিজ্ঞতার সাথে জিহাদ সম্পর্কে বয়ান করবেন ও লিখবেন তখন তা হবে নজীরবিহীন। এটা এমন দাওয়াত হবে যা হৃদয় ভেদ করে যাবে, পার্থিব সম্পদ ও ইজ্জত সম্মানের মহব্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে, অতীত ও বর্তমানকে মিলিয়ে একজন মুসলমানকে উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্ন দেখাবে। এর জন্য সে স্বীয় জান-মালের কুরবানী করাকে তুচ্ছ মনে করবে।

এমন একজন লোক যে জিহাদকে কুরআন-হাদীসে পড়েছে এবং ময়দানে এর স্বাদ গ্রহণ করেছে সে যে ঈমান ও বাহাদুরীর সাথে জিহাদের বর্ণনা দিতে পারবে সেটা শুধু জিহাদী কিতাব পড়ুয়ার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। মোটকথা উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন বয়ানে-লিখাতে জিহাদের কথা বলবেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে কোন জিহাদী সংগঠনের মুবাল্লিগ ও মুসান্নিফের জন্য চাই জিহাদী বাস্তব অভিজ্ঞতা।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য কথা হলো, এ যুগের জিহাদী ঘটনা বর্ণনার সময় অবশ্যই কোন প্রকার ভ্রান্তি ও জযবার আশ্রয় নেয়া যাবে না। এমনটি বর্ণনায় কোন প্রকার সামরিক অনভিজ্ঞতাও প্রকাশ পাবে না। যদি কোন ব্যাক্ত বর্ণনার সময় রকেট লাঞ্চার দিয়ে ব্রাশ ফায়ারের ঘটনা বয়ান করে কিংবা পিস্তল দিয়ে বিমান ভূপাতিত করার ঘটনা বলে, তাহলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে তা হাস্যকর ছাড়া কিছুই হবে না। এমনটি হলে জিহাদ ও মুজাহিদের প্রতি মানুষের অনাগ্রহই সৃষ্টি হবে।

দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারের কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বিষয়

উল্লেখিত তিনটি বিষেশত্ব তো দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারের জিম্মাদারদের থাকতে হবে, যাতে তারা জিহাদের মতো উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের ও মুজাহিদীনে কিরামের মতো বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং রাসূলে কারীম (সাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে উম্মাহকে জিহাদের দিকে ডাকতে পারেন। যেমন- ইরশাদ হচ্ছে- হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিতে থাকুন।

এখন কিছু এমন কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় আলোচনা করা যা এই শাখায় কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য জরুরী।

১. কটাক্ষ করা থেকে বিরত থাকা

জিহাদের বয়ান করতে কিংবা জিহাদ বিষয়ক লেখা লিখতে আবেগাপ্লুত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এটা একটা স্বভাবজাত বিষয়। কেননা জিহাদ আমলটাই এমন যে, এতে হৃদয় থেকে আবেগ উথলিয়ে মুখ ও কলমে এসে পড়ে এবং স্বভাবে এক ধরনের পবিত্র আবেগ ঢেউ খেলে যায়। বিষয়টি এ পর্যন্ত থাকলে আপত্তি নেই। বরং এমনটি হওয়া চাই। আর মুজাহিদের বিষয়টি এ পর্যন্ত এসেই ক্ষান্ত হওয়া চাই। এ থেকে আগে বেড়ে দীনের কোন শাখা-প্রশাখাকে হেয় প্রতিপন্ন করা চাই না এবং জিহাদকে অন্যান্য আমলের মুকাবেলায় আনা চাই না। এমনটি হওয়া খুবই দুঃখজনক।

তবে হ্যাঁ, নিকট অতীতে জিহাদের ব্যাপারে বেশ জুলুম ও অতিরঞ্জন করা হয়েছে। এই শাখাটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে অবলীলায়। কাফির ও মুসলিম বিদ্বেষীদেরকে খুশি করার জন্য জিহাদের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আনার অপছন্দনীয় ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! এখন সেই মাটি শুকিয়ে ধুলো হয়ে উড়ে গেছে– যা জিহাদের মুখে মারার জন্য তৈরি করা হয়েছিলো। এখন জিহাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অর্থ অনুধাবনকারী অনেক লোক তৈরি হয়ে গেছেন আল হামদুলিল্লাহ। আর ফাজায়িল এতো বেশি যে এর জন্য জিহাদকে কারো মুকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

জিহাদ বিষয়ক লেখক ও বক্তাদের একথা বুঝতে হবে যে, জিহাদ তো পূর্ণ দীনের হিফাজত কারী। মিসওয়াক এবং আযান থেকে নিয়ে নামায ও হজ্জ পর্যন্ত সকল বিধানাবলীর হিফাজতকারী। শুধু দীনের ফরযসমূহের নয়; বরং মুস্তাহাবের ও আদবসমূহেরও হিফাজতকারী হচ্ছে এই জিহাদ। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ইসলামী বিধানকে বিজয়ী করার মাধ্যম হলো এই জিহাদ। সুতরাং জিহাদকে এমনভাবে বয়ান করা যাবে না। যদ্দরুন খোদা-নাখাস্তা, কোন ইসলামী বিধানের প্রতিও বেইজ্জতি হয়। আল্লাহর শোকর। এ পর্যন্ত মুজাহিদীনে কিরাম এ বিষয়টির দিকে নজর রেখে আসছেন। কিন্তু কাজ

যতোই বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের লোক কাফেলায় শরীক হচ্ছে, ততোই ভুল-ভ্রান্তি, বে-উসূলী ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু একটি কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, কোন দীনি শাখার গুরুত্ব এভাবে বয়ান করা, যদ্বারা অন্য কোন শাখার বেইজ্জতি হয়, তা স্পষ্ট ফিতনা। এ ধরনের ফিতনার দরুন বড় বড় সংগঠন ও আন্দোলন ধ্বংস হয়ে গেছে।

সবিনয়ে বলতে চাই, আপনি জিহাদের বয়ান খুব বেশি করে করুন, সর্বক্ষেত্রে এই আলোচনা করুন, খুব দৃঢ়ভাবে এবং কার্যকরী পদ্ধতিতে জিহাদের বয়ান করুন, যদ্দরুন কাপুরুষতা ও গাফলতী দূরীভূত হয়– এমন যুক্তি ও সূত্রের মাধ্যমে বয়ান করুন. যার দরুন তাবীল ও তাহরীফের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এমন খোলামেলাভাবে বয়ান করুন যা সর্বস্তরের মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় এবং জিহাদ অস্বীকারকারী ও বিরোধিতাকারীর নিশ্চুপ হয়ে যায়; খুব ভালো কথা। কিন্তু বয়ানে এমন কোন কথা বলবেন না যদ্দরুন দীনের কোন শাখার মানহানি হয়। মাদরাসাসমূহ, খানকাসমূহ ও তাবলীগী জামাআতের গুরুত্বের উপর যেন কোন প্রকার চাপ না পড়ে। সুন্নাত ও আমলসমূহের যেন গুরুত্ব কম বুঝা না যায়। মোটকথা, দীনের যে কোন শাখায় কর্মরত ব্যক্তি যেন আপনার বয়ানে টার্গেট না হয় এবং তারা কষ্ট না পায়।

এখানে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট করে বর্ণনা করা জরুরী মনে করছি। আর তা হলো, যে ব্যক্তি দীনের কোন শাখার বর্ণনা ও ফজীলত বয়ান করতে গিয়ে অন্য শাখাগুলোকে তার মুকাবেলায় দাঁড় করায় এবং এই শাখার শ্রেষ্ঠত্ব বয়ান করতে গিয়ে অন্যান্য শাখাকে নীচু করে দেখায় সে মূলত নিজ শাখার তথা দীনের হিতাকাঙ্খী নয়। সে বরং তার শাখার ও ক্ষতি করেছে। এমনটি করতে তাকে কেউ বলেনি। এমনকি সেই শাখার প্রতিষ্ঠাতাও একাজ নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী ফিকির করেছেন এবং ধারণাতীতভাবে সফলও হয়েছেন কিন্তু তারা কখনো কাউকে টার্গেট বানান না। তাদের লিখনিতে ও বয়ানের দরুন কেউ কষ্ট পায়নি। বরং তাদের বয়ান ও লিখা ছিল দালিলিক ও সাধাসিধে।

আজকে যেন বিষয়টা পাল্টে গেছে। আজকাল কিছু লোক এমন রয়েছেন যাদের কথায় একটা বিরোধী পক্ষ না থাকলে কথাই যেন বনে না। এটা ইলমের দৈন্যতা, বুঝের অভাব এবং তাদের হৃদয়ে দীনের প্রতি আন্তরিকতা না থাকার আলামত। কেননা সে যে শাখাটিকে হেয় করছে, সেটাও তো দীনেরই একটি শাখা। সুতরাং সে দীনের একটি শাখার পক্ষ অবলম্বনের অন্তরালে দীনের ক্ষতি করছে। বস্তুত সে নিজেকে যে শাখার কর্মী মনে করছে, নিজের অজান্তেই সে সেই শাখারও ক্ষতি করছে। কেননা তার এ ধরনের আচরণের দরুন লোকেরা এই মহান শাখা তথা জিহাদের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে। এক পর্যায়ে টার্গেটকৃত শাখাগুলোর পক্ষ অবলম্বন করে উলামায়ে কিরামের এক শ্রেণী দাঁড়িয়ে যান এবং কথিত ব্যক্তির ছড়ানো বিভিন্ন কটাক্ষের জবাব দেন। এভাবে একটি বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

মুজাহিদীনে কিরামের পক্ষ থেকে যারা বয়ান ও লিখার কাজ করেন, তাদের এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, জিহাদবিরোধী লোক কম নেই। নতুন করে তাদের সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ করে দেয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

মনে রাখবেন, দীনের বিভিন্ন শাখা মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো। যেমন শরীরের এক অঙ্গের কাজ দেখা, এক অঙ্গের কাজ শোনা এক অঙ্গের কাজ চলা এবং এক অঙ্গের কাজ চিবানো ঠিক তেমনি দীনের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন কাজ রয়েছে।

যেমনিভাবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে অপরকে পূর্ণাঙ্গ সহায়তা করলে মানুষ আরাম পায় এমনিভাবে দীনের প্রত্যেকটি শাখার লোকজন একে অপরকে সার্বিক সহায়তা করলে উম্মাহ শান্তি পাবে; এমনকি পর্যায়ক্রমে পৃথিবীব্যাপী ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে দীনী শাখা-প্রশাখাগুলো একে অপরের পিছে পড়লে উম্মাহর শান্তি চলে যাবে। এমনকি কাফিররা এই সুযোগকে গ্রহণ করে মুসলমানদের সমুহ ক্ষতি সাধন করবে।

বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট করে বলবে– বর্তমান যুগে দীনের যেসব শাখা তৎপর এর ৪টি শাখা উম্মাতের জন্য খুব জরুরী। এগুলো হলো- ১. মাদরাসাসমূহ। ২. জিহাদ। ৩. খানকাসমূহ। ৪. তাবলীগ। যদি এ চারটি শাখা একে অপরকে যথাযথ সহায়তা করে তাহলে অসম্ভব নয় যে, অতি দ্রুত আল্লাহর ফজল ও করমে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার বিধান জারী হয়ে যাবে এবং খিলাফতের সেই যুগ আসবে– যার সুসংবাদ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দিয়েছেন।

২. ইলমী নির্ভরযোগ্যতা

জিহাদ বিষয়ক বয়ান ও লিখাতে একথা খেয়াল রাখা চাই যে, শুধু সেসব ফাজায়িলই বর্ণনা করতে হবে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে রয়েছে এবং শুধুমাত্র সেসব দলীল পেশ করা হবে যেগুলোর সনদ মজবুত। জিহাদ ইসলামের একটি ফরীযা– যার সপক্ষে কুরআন ও হাদীসে দলীলের কমতি নেই।

অবশ্য যে কোন বিষয়ের দলীল ও সূত্র উল্লেখ করতে দুর্বল ও ভিত্তিহীন দলীল পেশ করতে নেই। হাদীসসমূহ বয়ান করার পূর্বেও অত্যন্ত যাচাই বাছাই করে নেয়া চাই। আর জিহাদের ব্যাপারে বিষয়টির গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। কেননা অমুসলিমরা যতোটুকু দৃঢ়তার সাথে জিহাদের বিরোধিতা করছে আর কোন বিষয়ের তারা এতো দৃঢ়তার সাথে বিরোধিতা করছে না। এ জন্য এর সপক্ষে খুব মজবুত ও শক্তিশালী দলীল পেশ করা চাই, যাতে জিহাদ অস্বীকারকারী এবং জিহাদবিরোধী উভয়ই নিশ্চুপ হয়ে যায়। সাথে সাথে জিহাদের প্রকৃত রূপরেখা উম্মাতের সামনে এসে যায়।

অপর দিকে জিহাদের কাজ আল্লাহর ফজল ও করমে বিস্তৃতি লাভ করে চলছে, সর্বস্তরের লোক এতে এসে ভীড় জমাচ্ছে, এজন্য এসব সাধারণ লোককে মজবুত দাওয়াতের জন্য শুধুমাত্র সঠিক ও সহীহ কথাগুলো শিখিয়ে দেয়া চাই, যাতে সাধারণ মুসলমানের মাঝে দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীস ছাড়িয়ে না পড়ে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় একথা প্রমাণিত যে, কোন কাজের পরিধি যখন বেড়ে যায় তখন তাতে বিভিন্ন ভিত্তিহীন কথা ছড়িয়ে পড়ে, সেই কাজের লোকেরা বিভিন্ন কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে উলামায়ে কিরামের জন্য সে সব কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা বেশ কঠিন হয়ে যায়। এজন্য মুজাহিদীনে কিরামের উচিত, যে আয়াতের ব্যাখ্যা তিনি করবেন তার তাফসীর যেন গ্রহণযোগ্য মুফাসসিরদের কিতাবাদিতে দেখে নেন। হাদীস বর্ণনার সময় যেন যথাসাধ্য হাদীসসমূহের তাহকীক করে নেন। আর ফজীলত বর্ণনা করার সময়ও যেন শুধু জিহাদের ফজীলতের আয়াত ও হাদীসগুলোই বর্ণনা করেন। দ্বীনের অন্য শাখার ফজীলতের হাদীস ও আয়াত টেনে এনে তাবীল করে যেন বর্ণনা না করেন। কারণ দীনের কোন শাখার প্রতি অধিক দরদ দেখিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কিংবা লোক মুখে শ্রুত কথা চালিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা গোমরাহী ছাড়া কিছু নয়। এটা দীনের বিকৃতি সাধনও বটে। ইসলাম এর আদৌ অনুমতি দেয় না।

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি– আল হামদুলিল্লাহ! মুজাহিদীনে কিরাম এ ধরনের গোমরাহী থেকে এখনও মুক্ত রয়েছেন। ভবিষ্যতের জন্য খুব সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। যেসব সাধারণ মুসলমান ইখলাসের সাথে জিহাদের দাওয়াত দিতে আগ্রহী, তাদেরকে ট্রেনিং দেয়ার সময় নির্দিষ্ট কিছু আয়াত গ্রহণযোগ্য তাফসীরের ইয়াদ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। এমনিভাবে নির্দিষ্ট কিছু হাদীস সহীহ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ মুখস্থ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। তার সাথে কোন ঘটনা শেখাতে হলে অবশ্যই তা হতে হবে বুযুর্গানে দীনের গ্রহণযোগ্য ঘটনা। সাথে সাথে তাদেরকে বলা হবে যে, তারা যেন এর বাইরে অজানা ও নিশ্চিতভাবে না জেনে কোন ফাজায়িল বা মাসায়িল বর্ণনা না করে। একান্ত কোন কিছু বলার বা জানার প্রয়োজন হলে তা কোন হক্কানী বিদগ্ধ আলিমের কাছে জেনে নিবে।

৩. বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকা

একথা সত্য আজ শতকরা ৭৫ ভাগ যুদ্ধ মিডিয়ার মাধ্যমে চলছে। আর এর মধ্যেও কোন সন্দেহ নেই যে, ভালো সংবাদ ও ভালো রিপোর্টার এর

মাধ্যমে জনমত নিজের পক্ষে আনা যায় এবং নিজেদের অনুগামীদের হিম্মত বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বক্তৃতা ও লেখার মধ্যে অতির ন করাটাকে নিজেদের মিশন বানিয়ে নিয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়।

দুশমনকে হীনবল করার বিভিন্ন জায়িয পন্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে তাদেরকে হিম্মতহারা করা যেতে পারে। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে এর কি কোন যৌক্তিকতা আছে?

মোটকথা, মুজাহিদীনে কিরামকে তাদের বয়ান ও লিখতী উভয়টাতেই একশ' ভাগ সত্যের আশ্রয় নিতে হবে। নিজেদের মুজাহিদ ভাইয়ের বীরত্বের বর্ণনা বা শত্রু পক্ষের কাপুরুষতার বর্ণনা, নিজেদের শহীদদের ঘটনা বা কাফিরদের মরার কাহিনী কোন কমান্ডারের শাহাদাতের কিংবা গ্রেফতারীর ঘটনা কিংবা শত্রুদের পরাজয়ের ঘটনা ইত্যাদি সব কিছুতেই একশ' ভাগ সত্য বয়ান করতে হবে। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এর মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে বিরাট প্রভাব পড়বে এবং বিরাট সাফল্য আসবে।

বাস্তবতা হলো, জিহাদের ঘটনাবলী এমনিতেই এমন আকর্ষণীয় ও ইমাম তাজাকারী যে, তাতে কোন প্রকার বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই। হযরত শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ (রহঃ) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আফগানিস্তানের জিহাদের যেসব নির্বাচিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর বরকতময় ফলাফল আজ পৃথিবীর দেশে দেশে প্রকাশ পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মুসলমান সেসব ঘটনা শুনে ও পড়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন।

আল হামদুলিল্লাহ! এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত মুজাহিদীনে কিরাম শরীআতের উপর শতভাগ রয়েছেন এবং সতর্কতা ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ভবিষ্যতেও এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। কোন ক্রমেই যেন মুজাহিদীনে কিরামের প্রতি সন্দেহের অঙ্গুলি কেউ ওঠাতে না পারে।

৪. বিশ্বপরিস্থিতির উপর গভীর দৃষ্টি

দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার শাখার মুরুব্বী ও জিম্মাদারদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিশ্ব সংবাদের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে নানা

পরিবর্তন ও বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার তৈরি কৃত প্রোগ্রামসমূহ এবং রাজনৈতিক ও সামরিক রির্পোটসমূহের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। আজকাল অসংখ্য বিদেশী সংস্থা নিজ নিজ গোপন পদ্ধতিতে ইসলাম ও জিহাদের বিরুদ্ধে তৎপর রয়েছে। তারা বিভিন্ন নামে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

অবশ্য এখনো তারা প্রকাশ্যে ইসলামের দুশমনী করার হিম্মাত দেখাতে পারছে না। যারাই প্রকাশ্যে দুশমনী করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাদের অনেকেরই খুপড়ী ও মতবাদ উড়ে গেছে। জবাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে উচিতভাবে। এজন্য চালাক ও কুটিল দুশমন লেবাস পাল্টিয়ে চক্রান্তের জাল বুনে চলছে। বিশেষত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে চালাচ্ছে তাদের তথ্যসন্ত্রাস।

এজন্য দীনী এবং জিহাদী সংগঠনসমূহের জিম্মাদার লেখকবৃন্দ ও বক্তাবৃন্দের এসব সংবাদ মাধ্যম, তাদের বিশেষ রিপোর্টসমূহ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির প্রতি গভীর নজর রাখা চাই– যাতে তারা যথাসাধ্য সময় মতো তাদের চক্রান্ত ও পরিকল্পনা সম্পর্কে উম্মাহকে অবগত করতে পারেন। এতে এসব প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিরুদ্ধে সময় মতো সোচ্চার হওয়া সম্ভব হবে।

এসব প্রচার মাধ্যমের কিছু কিছু রিপোর্ট বা প্রোগ্রামের তৎক্ষণিক জবাব দিতে হবে। যেমন তারা বড় ও জনপ্রিয় কোন দীনী ব্যক্তিত্বের বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিছু বললো বা লিখলো তাহলে এর জবাব তাৎক্ষণিকভাবে দিতে হবে। এ কাজটা দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার বিভাগের দায়িত্বে ন্যস্ত।

দ্বিতীয় যে কাজটা এই বিভাগের লোকদের করতে হতে তা হলো, কোন অশালীন প্রোগ্রাম কিংবা কোন বিতর্কিত মন্তব্য অথবা কোন ভুল সংবাদ প্রচার করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় ও খুব সতর্কতার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের ও সর্বস্তরের মুসলমানদের উদ্বেগের কথা জানাবেন। এতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে। এমনিভাবে বিষয়টি যদি মহিলা বিষয়ক হয় তাহলে মুসলমান মহিলাদের মাধ্যমে প্রতিবাদ লিখে প্রেরণ করবে।

হতে পারে ভ্রান্ত চিন্তার লোকেরা তাদের কাছে পত্র লিখে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করবে এবং ইসমের বিরোধিতায় তাদেরকে আরো এগিয়ে দিবে। এতে প্রোগ্রাম কর্তৃপক্ষ মনে করবে যে, তাদের পক্ষেই রায় আসছে। অথচ বাস্তব অবস্থা ভিন্ন তাই অবশ্যই এ ধরনের মুহূর্তে প্রতিবাদলিপি পাঠাতে বিন্দুমাত্রও অবহেলা করবে না।

অনেক সময় সাদা দিল মুসলমান নারী-পুরুষ সেসব অনুষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ রহস্য বুঝতে না পেরে সেটাকে সহজভাবে মেনে নেয় এবং সেই মতে ধারণা পোষণ করতে থাকে। এজন্য দেখা যায়, ভালো ভালো দীনদার লোক সুপরিচিত ইসলামী প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন ও ব্যক্তির ব্যাপারে মিডিয়ার অপপ্রচারের দরুন বিরূপ ধারণা পোষণ করতে থাকে। এটা স্রেফ সেসব তথ্যসন্ত্রাসের বিষফল। ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোর মধ্যে বিশেষ করে ব্রিটিশ ব্রড কাস্টিং লন্ডন (বিবিসি লন্ডন) ভয়েস অফ আমেরিকা ও ভয়েস অফ জার্মানীর বাংলা, উর্দু, হিন্দী ও আরবী প্রোগ্রামগুলোর প্রতি বিশেষ নজর রাখা চাই। এসব প্রচার মাধ্যম অবশ্য কিছু কিছু সংবাদ পার্যালোচনা, বুলেটিন নিরপক্ষও প্রচার করে। তারপরও সব বিষয়ে এদের উপর আস্থা রাখা মুশকিল।

যেসব দেশে ইসলামী আন্দোলন চলছে, সেখানকার সহীহ ও নির্ভুল অবস্থা ও তথ্যাদি এসব মিডিয়া থেকে পাওয়ার আশা করা যায় না। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর জন্য গ্রহণযোগ্য মিডিয়ার সহায়তা নেয়ার বিকল্প নেই। এই দায়িত্বটাও দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার শাখার।

উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার শাখার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি খুব নজর রাখতে হবে।

যথা :

১. বক্তৃতা ও লেখাতে আক্রমাণাত্মক পদ্ধতি পরিহার করবে।

২. উম্মতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগত মাসায়িল তথা বিষয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকবে। এসব বিষয়ে জড়াবে না।

৩. বর্তমান পৃথিবীতে চলমান ইসলামী আন্দোলনসমূহের পূর্ণ পরিচিতি সাথীদের সরবরাহ করবে।

৪. কোন ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তির প্রশংসা বা সমালোচনার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা ও মার্জিত পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

৫. এমন কোন কাজ, পদ্ধতি বা পন্থা অবলম্বন করবে না; যদ্দরুন মানুষ জিহাদ ও মুজাহিদের বিপক্ষে চলে যায়।

৬. জিহাদের সাথে সাথে অবশ্যই ঈমান ও তাকওয়ার দাওয়াতও দিবে। কেননা পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও তাকওয়া থাকলে জিহাদ পূর্ণাঙ্গ হবে।

৭. আকাবিরে দীন ও পূর্ব-পুরুষদেরকে কটাক্ষ সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণ বেচে থাকবো।

৮. নিজের সংগঠনের পরিচিতি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ও সংক্ষিপ্তাকারে দিবে। তবে নিজের মিশন ও উদ্দেশ্যের দাওয়াত দিবে সুন্দরভাবে।

৯. লেখা ও বক্তৃতাতে উম্মাতের সর্বস্তরের মানুষের খেয়াল রেখে কঠিন শব্দ ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় কথা ও অধিক বর্ণনা থেকে বিরত থাকবে। এতে করে অল্পশিক্ষিত পুরুষ কম শিক্ষিত মহিলা ও সুশিক্ষিত পুরুষরাও বিষয়টি সহজভাবে হৃদয়াঙ্গণ করতে পারবে।

১০. পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা ও বিবরণের উপরই সাধারণ ভাবে আস্থা রেখে আমল করবে। যথাসাধ্য অধিক নতুন গবেষণা, ব্যাখ্যা ও তাফসীর তাশরীহের পিছে পড়বে না। কেননা উম্মাতের এখন দীনী ব্যাপারে গবেষণার কর্ম এবং আমলের বেশি প্রয়োজন। এজন্য অধিক যেসব সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য গবেষণা হয়েছে সেগুলোর উপর আমল ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করা দরকার।

তারবিয়াতী নিসাব

দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী হলো তারা সর্বস্তরের সাথীদের জন্য বিশেষত সাধারণ মুসলমানদের জন্য তারবিয়াতী বিষয় নির্ধারণ করবে। তাদের জন্য এমন একটি নেসাবনামা তৈরি করবে, যা তাদের সবার জন্য বাধ্যতামূলক; এ থেকে কেউ বাদ যাবে না। সংগঠনের সাথীদের এই নেসাবনামা তথা সিলেবাস মুখস্ত করতে হবে। এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে সাথীদের মেযাজ।

এই নেসাবনামা স্থান-কাল-পাত্র ও ব্যক্তি হিসাবে বিভিন্ন রকম হতে

পারে। অর্থাৎ, ছাত্র, শিক্ষক, উলামা, সাধারণ মানুষ ইত্যাদি স্তর ভেদে নেসাবনামা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আবার দেশ হিসাবেও এর মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। তবে কিছু বিষয় এমন থাকবে, যা সকল নেসাবনামায় থাকবে। অনুবাদক।

উদাহরণসুরূপ আমরা নেসাবনামার কিছু বিষয় নিম্নে উল্লেখ করলাম।

১.সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা, তরজমা ও ব্যাখ্যাসহ। আলেম না হলে কোন আলিমের নেগরানীতে। ২. জিহাদের চল্লিশ হাদীস; তরজমা ও ব্যাখ্যাসহ। ৩. সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামের ইতিহাস। ৪. সাবাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও বুযুর্গানে দীন (রহঃ) এর জিহাদী ঘটনাবলীর বই। ৫. সমকালীন জিহাদী আন্দোলনগুলোর পরিচিতি। ৬. ইসলামী আকীদা। ৭. নবী জীবনের সর্ব স্তরের সুন্নাত সমূহ ও মাসনুন দুআসমূহ। ৮. ইসলামী আখলাক। ৯. পৃথিবী, মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহের পরিচিতি তথা সীমানা, আয়ের উৎস, ধর্ম, জনসংখ্যা ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। ১০. সমকালীন ও অতীতের বিশেষ ব্যক্তিদের পরিচিতি। ১১. বিবিধ।

উল্লেখিত নেসাবনামা লেখার পূর্বে সূত্র হিসেবে ব্যবহার্য কিতাবাদি সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলো হতে হবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। পুরাতন কোন গ্রহণযোগ্য কিতাব উল্লেখিত বিষয়ে থাকলে তাই নেসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আর না থাকলে নতুন করে লেখা যেতে পারে। এ ধরনের নেসাব তৈরি জিহাদী সংগঠনগুলোর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

সাধারণ নেসাবনামা ছাড়াও আরো কিছু বিষয় মুজাহিদদের জন্য অপরিহার্য থাকবে। যেমন, জামাআতের ইহতিমাম, নির্দিষ্ট তারবিয়াত, কুরআন তিলাওয়াত জানা এবং নিয়মিত নির্দিষ্ট অংশ তিলাওয়াত করা, তাহাজ্জদ, ইশরাক, আউয়াবীন এর নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া চাই। সাথে সাথে প্রত্যহ কিছুক্ষণ সম্মিলিত যিকির সম্ভব না হলে একাকী উচ্চ আওয়াজে কিছুক্ষণ কিছু যিকির করা চাই। প্রত্যহ কিছু ব্যায়ামও মুজাহিদদের প্রতিদিনের আমলনামায় থাকবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

নেতৃবৃন্দ ও মুজাহিদীনে কিরামের তালীম-তারবিয়াতের সময় এ কথা মনে রাখবে যেন তাদের কলব ও ফিকির উভয়টাই যেন জিন্দা ও আলোকিত

থাকে। কেননা উম্মাতের মধ্যে এমন শ্রেণীও রয়েছে যাদের কাছে শুধু দিলের ইসলাহ ও সংশোধনের উপর খুব জোর দেয়া হয় যিকির ও মুরাকাবা করানো হয়, নফসের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের মুজাহাদা করানো হয়; কিন্তু তাদের খেয়াল থেকে ইসলামের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং মুসলমানদের নিরাপত্তার বিষয়টা অনুপস্থিত থেকে যায়। তারা মুসলমানদের জাতীয় বিষয় শোনাকে গুনাহ্ এবং ইসলামের বাস্তবায়নের মেহনতকে সময়ের অপচয় মনে করে। তাদের কাছে নিজের নফসকে বারবার জবাই করা তো গুরুত্ব পায় কিন্তু আল্লাহর দুশমনদেরকে জবাই করার কথাকে তারা খুবই অপছন্দ করে।

নিঃসন্দেহে তারা নিজেদের দিল জিন্দা করেন এবং নিজেদের নফসের ইসলাহের জন্য মেহনত করেন। কিন্তু অনেক ইসলামী ইজতেমায়ী জিম্মাদারী থেকে দূরে থাকেন। তাদের হৃদয় ইসলামের ইজ্জত বুলন্দীর চেষ্টা কুশেশের উষ্ণতায় গরম হয় না। নিজেদের সীমিত চিন্তা এবং সংক্ষিপ্ত জীবনের চিন্তার ব্যস্ততায় থাকা অবস্থায় দুনিয়ার ফিকির করা, জালিম ক্ষমতাসীনদেরকে হঠানোর ফিকির কর, কাফিরদের হাত থেকে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ফিকির করা এমন এক রাজনীতি যার পিছে পড়লে (তাদের মতে) মন-মস্তিষ্ক (নাউজুবিল্লাহ) নাপাক হয়ে যায়।

উম্মাতের মধ্যে আর এক শ্রেণী রয়েছে যাদের চিন্তা-ফিকির তো অনেক উর্ধ্বে, কিন্তু এরা আবার নফসের ইসলাহকে একটি বেহুদা ও বেকার কাজ মনে করে (নাউজুবিল্লাহ)। এ ধরনের লোকেরা মুসলমানদের সমস্যাবলী নিয়ে বেশ আলোচনা করতে পারেন, রাজনীতির উত্তাল জোয়ার সম্পর্কেও তারা সচেতন, তাদের মুখে ইসলামী বিপ্লবের শ্লোগানও শোনা যায় অহরহ, কিন্তু তাদের সকল চিন্তা-চেতনার সীমানা দেমাগও গলা পর্যন্ত। তাদের হৃদয় ইসলামী আদর্শের ণূরে ণূরান্বিত নয়, তাদের ফিকিরও নয় এমনটি তাদের হৃদয় আল্লাহর যিকিরের প্রকৃত স্বাদ থেকে মাহরুম, কিন্তু সে ব্যাপারে তাদের পরওয়া নেই। ইসলামী হুকুমতের জন্য বাধা, ক্ষমতাসীন জালিমদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়ার জন্য তাদের কাছে অনেক সময় আছে, কিন্তু নামাযের পর আল্লাহর কাছে হাত তুলে একটু কাকুতি-মিনতি করার সময় তাদের নেই।

এ ধরনের লোকেরা মসজিদে মেহমানদের মতো আসে আর নামায শেষ হতে না হতেই বাচ্চাদের মতো জুতা বগলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। তাসাওউফ এদের কাছে যেন রূপকথার মতো। আর নফসের ইসলাহ যেন তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় ও হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

তারা সকাল-সকাল প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের ছোট বড় সকল শিরোনাম পড়তে সময় পায় কিন্তু নামায পড়ে খুব সংক্ষিপ্ত। আর নামাযে খুশু-খুজু নেই বললেই চলে। তাদের নিজেদের মেহনতের উপর ভরসা আছে। কিন্তু সালাতুল হাজাত ও সালাতুল ইস্তিখারার প্রতি তাদের তেমন একটা প্রয়োজন বোধ হয় না।

আমরা অতিরঞ্জন করছি না, বরং আজও উম্মাতের এই দুটি শ্রেণীর লোক অহরহ দেখা যাচ্ছে। এজন্য জিহাদী সংগঠনগুলোর উচিত তারা যেন এমন ব্যবস্থা নেন, যাতে আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহে নফসের ব্যবস্থা থাকে এবং সাথে সাথে পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ রাখারও ব্যবস্থা থাকে। এখানে যেন আল্লাহর দরবারে পড়ে রোনাজারিরও ব্যবস্থা ও পরিবেশ থাকে।

এই নেসাবনামায় যেন নিজের ইসলাহের ব্যাপারে ফিকির সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকে এবং এতে যেন থাকে ইসলামকে জয়ী করার অনুভূতি সৃষ্টির ব্যবস্থা। নিজের নফসকে জবাই করার ব্যবস্থাও যেন থাকে এতে, সাথে সাথে আল্লাহর দুশমনদের শিরোচ্ছেদ করার চেতনাও যেন এতে পাওয়া যায়। মুখ দিয়ে যেন ভালো কথা বের হয়, সাথে সাথে হৃদয়ও যেন থাকে ঈমানী নূরে নূরান্বিত। কুরআন মজীদের আহ্বানও যেন এরা বুঝতে সক্ষম হয় এবং এদের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বতও যেন না থাকে।

মনে রাখবেন, ফিকির ও চিন্তা-চেতনায় পরিশুদ্ধতা আনা নফসের ইসলাহ করা ছাড়া সম্ভব নয় এবং নফসের ইসলাহের ব্যবস্থা করা ব্যতীত উম্মাতের সম্মিলিত জীবনে কল্যাণ আনা সহজ নয় এসব কথা মনে রেখে সেই অনুযায়ী যদি তালীম-তরবিয়াত দেয়া হয়। তাহলে আশা করা যায় যে, ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা এমন মুজাহিদ তৈরি হবে যারা হবে রাতের দরবেশ আর দিনের বাঘ। এমনটি হলে উম্মাহর বিজয়ের দিন বেশি দূরে নয়। আমরা হতাশ নই বরং সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় যিকির ও ফিকিরের সাথে অপেক্ষমান।

جہاد کا شعبہ

مالیات

জিহাদের অর্থনৈতিক শাখা

জিহাদের অর্থনৈতিক শাখা

নববী দাওয়াতের প্রথম ধাপ ছিল জনসাধারণকে জিহাদ তথা ইসলামের জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যায় ও জীবন দান করার নিমিত্তে যোগ্যরূপে গড়ে তোলা। জিহাদের জন্য দক্ষ জনশক্তি গঠন করা এতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে মুজাহিদ হওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং নিতান্ত অক্ষম লোকদের ছাড়া প্রত্যেকের জন্য মুজাহিদ সূলভ জীবন-যাপন এবং জিহাদের জন্য ধন-সম্পদ উৎসর্গ করাকে জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। বিশেষ করে অর্থ ব্যায়ের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অপরিশীম। কেননা অর্থ জিহাদের মূল চালিকা শক্তি। তাই মালী ফান্ডকে মজবুত করার জন্য জিহাদের অর্থনৈতিক শাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

—মাসউদ আযহার

জিহাদের অর্থনৈতিক শাখা

জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে অধিক আলোচনার দ্বারা সহজে বুঝা যায়। কুরআন-হাদীসের অসংখ্য স্থানে মুসলমানদেরকে জিহাদের কাজে অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে।

জিহাদের ময়দানে একজন মর্দে মুমিনের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অর্থ-কড়ি ও সরঞ্জামাদির। জিহাদী সংগঠনগুলোর উচিত মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা।

একটা সময় ছিলো, যখন উম্মাতের মধ্যে জিহাদের চর্চা ছিলো, মুজাহিদদেরকে সবচে' উত্তম মনে করা হতো এবং জিহাদের রাস্তায় ব্যয় করাকে ঈমানের পর বড় কাজ মনে করা হতো। কিন্তু আজকের অবস্থা অনেক পাল্টে গেছে। জিহাদ বুঝার লোক কম; জিহাদী সংগঠনগুলো রাজনৈতিক সমালোচনার শিকার। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যেও মালের মহাব্বত এসে গেছে। পরিণতিতে মুসলমানদের মধ্যে মজুদদারী ও মাল কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। সম্পদশালীদের মধ্যে আরামপ্রিয়তা ও ধর্মবিমুখতা দেখা দিয়েছে প্রবলভাবে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় দীনী সকল শাখার অর্থনৈতিক ব্যয়ভার মুষ্ঠিময় এমন কয়েকজন মুসলমানের উপর এসে পড়েছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করাকে নিজের জন্য খোশ নসীবী মনে করে। আল্লাহ তা'আলা এই শ্রেণীকে ঈমানের সাথে সাথে প্রশস্ত হৃদয়ও দিয়েছেন।

এই তো হলো জিহাদের রাস্তায় অর্থনৈতিক উৎসর অবস্থা। অথচ দিন দিন জিহাদের ব্যয় বেড়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। কেননা কাফিরগোষ্ঠী মুসলমানদের উদাসীনতাকে সুবর্ণ মনে করে অঢেল সামরিক শক্তি গড়ে তুলেছে, যার মুকাবিলা করার জন্য চাই প্রচুর অর্থ ও সরঞ্জাম।

হ্যাঁ! এতে সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর প্রতিটি ময়দানে নিরস্ত্র মুসলিম মুজাহিদরা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ও মজবুত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা বাহিনীকে নাকানী চুবানি খাওয়াচ্ছে, আল্লাহর বিশেষ মদদে তারা পরাস্ত করে চলেছে বিভিন্ন দেশের চৌকস সেনা সদস্যকে; তারপরও আসবাব ও সরঞ্জামাদির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

আজকাল কোন ছোট সামরিক অভিযানের ব্যয় অন্য কোন দীনী কাজের বার্ষিক ব্যয়ের সমতুল্য হয়ে যায়। আর যখন জিহাদী কাজ কোন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে চলতে থাকে এবং আল্লাহর সেনারা ময়দানে দীন ও ইসলামের দুশমনদের মুকাবিলা করতে থাকে, তখন তো ব্যয় বেড়ে যায় সীমাহীনভাবে। তখন পিছে হটারও সুযোগ নেই। কারণ, আল্লাহর সৈনিকরা পিছু হটে না। তারা হয় তো শহীদ হয় না হয় গাজী হয়। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

সর্বপ্রথম আমানতদার, বুঝমান, মেহনতী, যোগ্য ও লেনদেনে অভিজ্ঞ লোকদেরকে এই শাখায় নিয়োগ দিতে হবে। এরা এই শাখাটিকে স্বাধীনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে গঠন করে নিবে। তবে এখানেও একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা হলো– এই সাথীরাও হবে মুজাহিদ। অর্থাৎ মুজাহিদ সাথী থেকেই অর্থনৈতিক শাখার সাথী নির্বাচন করতে হবে।

অর্থনৈতিক শাখার বুনিয়াদি

তিনটি বস্তুর উপর যদি অর্থনৈতিক শাখার বুনিয়াদ রাখা হয় তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ জিহাদের এই শাখাটি যথাযথভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। বস্তু তিনটি হলো– ১. সম্মানবোধ ২. নিরাপত্তা। ৩. তাকওয়া।

অর্থাৎ জিহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহের পন্থাটি হবে সম্মানজনক এবং সংগ্রহ কারীরা হবেন যথাযথ দায়িত্বশীল। আর সে সম্পদ সংগ্রহের পর তার হিফাজত করা হবে পূর্ণ মাত্রায়, কোন প্রকার তসরুফ বা খিয়ানত হবে না তাতে এবং তা ব্যয় করা হবে অত্যন্ত তাকওয়ার সাথে তাহলে এই শাখা শক্তিশালী হবে এবং যথাসময়ে মুজাহিদীনে কিরামের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হবে।

এ তিনটি বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. সম্মানবোধ যদি সম্মানজনক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পন্থায় জিহাদের অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তাহলে তাতে জিহাদ ও মুজাহিদীনে কিরামের ইজ্জতহানি হবে। এতে জিহাদী আন্দোলন হবে বাধাগ্রস্ত। সুতরাং অসম্মানজনক কোন পন্থা অবলম্বন করা হবে না এই অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে।

তবে হ্যাঁ, ব্যক্তি ও স্থান বিশেষে সম্মানের বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন হবে। এমন আল্লাহওয়ালা লোকও রয়েছে দীনের উদ্দেশ্যে যদি কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে উপস্থিত হয় তাহলে তিনি সেটা খোশ নসীবী মনে করেন। এ ধরনের ব্যক্তির সামনে জিহাদের চাঁদার জন্য চাদর বিছাতে দোষ নেই। এতে অসম্মানের কিছু নেই। খোদ নবীজী (সাঃ) মসজিদে নববীতে জিহাদের আসবাব সংগ্রহের জন্য এলান করেছেন নিজের, চাদর মুবারক বিছিয়েছেন।

যদি লোক এমন না হয়, বরং তার কাছে চাঁদা চাইলে তিনি তা খারাপ মনে করেন, তিনি এ ধরনের চাঁদা গ্রহণকে ভিক্ষাবৃত্তি মনে করেন তাহলে এ ধরনের ব্যক্তির কাছে গিয়ে জিহাদের বেইজ্জত করার আদৌ দরকার নেই। আল্লাহর দীন খোদ আল্লাহ তা'আলা হিফাজত করবেন। দীনের নামে জিহাদের পথে নেমে জিহাদকে বেইজ্জত করার অনুমতি ইসলাম আদৌ দিতে পারে না।

ইংগিতে জিহাদী অর্থব্যবস্থা সংগ্রহের বিষয়টি বলা হলো। এতে গনীমতের পথসহ আরো অনেক পথ থাকতে পারে।

২. নিরাপত্তা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্জিত অর্থসমূহের বুনিয়াদি হিফাজতের ব্যবস্থা করা। কেননা এসব তখন যদি জমা হওয়ার সাথে সাথেই খরচ করে ফেলা হয় তাহলে প্রয়োজনের মুহূর্তে বিরাট অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিবে। এক পর্যায়ে জিহাদী সংগঠনও বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হলো, অর্জিত সংগৃহীত অর্থসমূহের হিফাজতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা।

এই সুষ্ঠু ব্যবস্থা হিসাবে এসব অর্থ দিয়ে কম লোকসানের আশংকার ব্যবসা বাণিজ্য করা যেতে পারে, লাগানো যেতে পারে অর্থগুলো কোন

নিরাপত্তাপূর্ণ ব্যবসায়। এতে করে জিহাদী সংগঠনগুলো যেমন অর্থ-সংকট মুক্ত হবে সাথে সাথে কাজও আগে বাড়িয়ে নেয়া সহজতর হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এই অর্থ সংগ্রহ ও তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা আদৌ আমাদের মাকসাদ নয়, আমাদের মাকসাদ ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়িম করা।

৩. তাকওয়া

তৃতীয় বস্তু যা সবচে' বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলো মাল সংগ্রহে, হিফাজতে ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করা। আয়-ব্যয়ের এক এক পাইয়েরও যেন হিসাব থাকে। যে খাতের অর্থ সে খাতেই ব্যয় করবে এক খাতের অর্থ কখনো অন্য খাতে ব্যয় করবে না। বিশেষ করে যাকাত ফিতরার বিষয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করবে।

সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনের বেশি ব্যয় করবে না। এই বিষয়টা খুবই নজরে রাখবে। অপব্যয় হলে আর কিন্তু বরকত থাকবে না। সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতা থেকে নিয়ে বাবুর্চি পর্যন্ত সবাইকে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদানের ক্ষেত্রে পাবন্দ রাখবে। কাউকে হিসাব ছাড়া এক পয়সাও দিবে না।

হিসাব গ্রহণের বিষয়টি হবে খুবই মার্জিত। তবে এ থেকে কাউকেই ঊর্ধ্বে রাখা যাবে না। অনেক মুত্তাকী-পরহেযগার লোক থেকে হিসাব নেয়া হয় না। এটাও ঠিক নয়। কেননা সবার থেকে হিসাব না নিলে ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে। আর আমার মতে মুত্তাকী-পরহেযগারদের থেকেও পূর্ণ মাত্রায় হিসাব নেয়া চাই। যাতে তারা কখনো শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজেদের তাকওয়া খুইয়ে না বসেন। মোটকথা আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকবে সাফ-শাফফা দুধের মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অর্থনৈতিক শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

অর্থনৈতিক শাখার দায়িত্বশীলগণ সহযোগিতা করে দু'ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা ও হ্যান্ডবিল প্রকাশ করে যাবেন। যথা ১. জিহাদের রাস্তায় ব্যয়ের গুরুত্ব ও ফজীলত সম্বলিত বই-পুস্তক। কুরআন-হাদীসে এতদসংক্রান্ত যেসব বিষয় আছে তা জনগণের সামনে তুলে ধরবেন। কেননা

সাধারণ মুসলমান এ ব্যাপারে নানা রকম বিভ্রান্তিতে পতিত, নানা রকম রূপক অর্থের বেড়াজালে আবদ্ধ। এজন্য এরা সহীহ রাস্তায় ব্যয় করতে পারছে না। অর্জন করতে পারছে না সমূহ ফজীলত। সুতরাং প্রকাশনা ও অর্থনৈতিক শাখা যৌথভাবে উল্লেখিত কাজটি করবেন পূর্ণ মাত্রায়।

এমনিভাবে মুসলমানদের কুফরী শক্তি কুট-কৌশল ও বহুমুখী চক্রান্তের বিষয়টিও অবগত করাবে। সাথে সাথে এর বিকল্পস্বরূপ জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করবে। এতে মুসলিম উম্মাহ তাদের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে।

এ ধরনের কিতাবে জিহাদে অর্থ ব্যয়ের বিষয়টিও উল্লেখ করবে। সাথে সাথে মুজাহিদীনে কিরামের ইসলামে গুরুত্ব ও ফজীলতের বিষয়ও স্পষ্ট করে তুলবে।

আরেকটি বিষয় এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলোতে উল্লেখ করবে তা হলো– মুজাহিদরা কোন কোন খাতে কি পরিমাণ খরচ করছেন তার একটি ফিরিস্তি পেশ করবে। তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার আওতায় আরো কতো অর্থ প্রয়োজন তার একটি হিসাব দিবে। এতে করে আগ্রহী মুসলমানরা জিহাদের পথে ব্যয় করতে এগিয়ে আসবে।

এসব পুস্তক-পুস্তিকার ভাষা হবে খুব মার্জিত ও শালীন। এখানে সুন্দরভাবে আল্লাহর ব্যয়ের আয়াত-হাদীসসমূহ উল্লেখ করে জিহাদের পথে ব্যয়ের কথা উল্লেখ করবে, কিন্তু সুওয়াল করবে না। কেননা প্রত্যেক মুজাহিদের এই বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে রয়েছে এ পৃথিবীর সকল খাজানার চাবি আল্লাহই তার জিহাদের প্রয়োজন মিটাবেন।

ইসলামী বিধানাবলীর আলোকে মুজাহিদীনে কিরামের ফরীযা হলো তারা উম্মাহকে এই পথের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করবেন এবং তাদেরকে এই পথে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাবেন। তাদেরকে কুফরী শক্তির নাপাকি ইচ্ছার কথা জানাবেন। বলবেন এতদসংক্রান্ত হাদীসের কথা। ব্যস; এরপর সৌভাগ্যবানরা উঠে দাঁড়াবেন। আর যারা সৌভাগ্যবান নন, তাদের সামনে হাত পাতা যাবে না, এতে জিহাদ ও মুজাহিদের বে-ইজ্জত হবে; যদিও তারা

নিজের জন্য হাত পাতছেন না। হাত পাতছেন ইসলাম ও মুসলমানদের হিফাজতের জন্য। তারপরও তারা এমনটি করবেন– এটা উচিত হবে না।

২. দ্বিতীয় প্রকার পুস্তক-পুস্তিকা এ ধরনের হওয়া চাই– যেগুলোতে জিহাদী সম্পদের ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা সম্বলিত কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি থাকবে। সাথে সাথে অপচয় ও খিয়ানতের উদ্ধৃতিসমূহ খুব জোরালোভাবে লেখা হবে। এতে করে এ শাখার সাথে সম্পৃক্ত সর্বস্তরের সাথীরা সতর্ক থাকবে।

অর্থনৈতিক শাখার আরেকটি দায়িত্ব

কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক শাখার আরেকটি দায়িত্ব হলো তাদের কাছে সংগঠনের সকল সম্পদের হিসাব থাকতে হবে। এতে সুবিধা হলো, কখনো সেগুলোর কোনটি বা কোন অংশ খোয়া গেলে তার হিসাব করা বা তদন্ত করা সহজ হবে। সবচে' বড় বিষয় হলো– এতে কেন্দ্রের পূর্ণ প্রভাব থাকবে শাখা অফিসগুলোর উপর। খোদা নাখাস্তা, কখনো কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির কবলে অর্থনৈতিক কোন শাখা পতিত হলে তার সুষ্ঠু সমাধান করা সহজতর হবে। অর্থনৈতিক শাখার উচিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় আমীর বা মজলিসে শুরার পরামর্শে সংগঠনের সকল সম্পদ কয়েকজন গ্রহণযোগ্য ও বুযুর্গ আলিমের নামে রেজিস্টর্ড করানো। অথবা কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান করে তার রেজিস্ট্রেন করে তার আওতায় সকল সম্পদ নিয়ে আসবে। সাথে সাথে একথা মনে রাখবে যে, কখনোই এ সকল সম্পদ কোন জিহাদী সংগঠনের নামে বা কোন জিহাদী ব্যক্তিত্বের নামে রেজিস্ট্রেশন করবে না। কারণ, যে কোন সময় উক্ত সংগঠন বা ব্যক্তির উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে। তখন কিন্তু সকল সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই সমস্যা হওয়ার পূর্বে সতর্ক হওয়া উত্তম।

جہاد کا
عسکری
شُعبہ
জিহাদের সামরিক
শাখা

জিহাদের সামরিক শাখা

১.

সামরিক শাখাই জিহাদের প্রধান শাখা। অন্যান্য শাখাগুলো এই প্রধান শাখাটিকে সক্রিয় রাখতে ও পূর্ণতায় পৌছাতে সহায়ক মাত্র। এই জন্য এ শাখার দায়িত্বও অনেক এবং নিয়মনীতিও অধিক।

ঈমান ও তাকওয়ার পর (কেননা এ দুটি বস্তু একজন মুজাহিদের জন্য ফরয) একজন মুজাহিদের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি বস্তুর প্রতি একান্ত দৃষ্টির বিষয়। বস্তু তিনটি হলো– ১. উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ। ২. আনুগত্য। ৩. কৌশল।

২.

মুশরিক, ইয়াহুদী কিংবা অন্য কোন ইসলাম-দুশমন শক্তি সবারই একটি অভিন্ন দুর্বলতা রয়েছে সেটি হচ্ছে– তাদের সকল কিছু নির্ভর করে গুটি কয়েক ব্যক্তির উপর। তাদের শান-শওকত, বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ সব কিছু বিলোপ হয়ে যাবে যদি সেই গুটি কয়েক ব্যক্তিকে দমিয়ে দেয়া যায়।

সামরিক শাখা

অবশ্য সকল মুসলমানের উচিত সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। এটা মুসলিম উম্মাহর রক্ষা করা। তাছাড়া পবিত্র কুরআনে এর প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে–

واعدوا لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تفلحون هم الله يعلمهم وماتنفقوا من شيئ فى سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون.

অর্থ– আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের উপরও, যাদেরকে তোমরা জানো না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। -সূরা আনফালঃ ৬০।

হ্যাঁ, কোন মাজুর মুসলমান থাকলে তা ভিন্ন কথা। তবে আজকাল অনেক জিহাদের ময়দানে অনেক মাজুর মুসলমান বেশ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। মুজাহিদীনে কিরামের তো অবশ্যই পূর্ণ জিহাদী ট্রেনিং থাকতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই। ঈমান ও তাকওয়ার পর এ দুটি বস্তু মুজাহিদীনে কিরামের জন্য অন্যতম ফরীযা। নিম্ন বর্ণিত তিনটি বস্তুর প্রতি মুজাহিদীনে কিরামের বিশেষ নজর রাখা চাই। বস্তু তিনটি হলো– ১. উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ। ২. আনুগত্য। ৩. কৌশল। একজন মুমিন মুত্তাকী মুজাহিদ এ তিনটি বস্তুর প্রতি যতো নজর রাখবে তার দ্বারা ততো ফায়দা হবে। তার কাজের মধ্যে ততো শক্তি ও বরকত পয়দা হবে। নিম্নে প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

সামরিক প্রশিক্ষণ

মুসলমানদের উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। অন্যথায় সে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে কিভাবে?

নিম্ন লিখিত তিনটি বস্তুর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। যথা- ১. উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ। ২. আনুগত্য। ৩. কৌশল।

একজন মুমিন ও মুত্তাকী মুজাহিদ এ তিনটি বস্তুর প্রতি যতো গুরুত্ব দিবে ততোই সে লাভবান হবে, উপকৃত হবে উম্মাহ।

১. উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ

তিনটি বস্তুর মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো। উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ, একজন মুজাহিদকে সব ধরনের আধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। এই প্রশিক্ষণ অস্ত্রেও হতে পারে। হতে পারে শারীরিক এবং মানসিকও। মোটকথা, সব ধরনের ট্রেনিং থাকতে হবে, যাতে একজন মুজাহিদের মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা না থাকে।

তালীম ও তারবিয়াত ছাড়া একজন মুজাহিদের জন্য জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এমনিভাবে অল্প প্রশিক্ষণও সন্তোষজনক ফল বয়ে আনতে পারে না সাধারণভাবে। আজকের বিশ্ব যেহেতু যুদ্ধের ময়দানে অনেক এগিয়ে গেছে, তাই মুসলমানদেরও উচিত এ বিষয়ে যথাযথ মনোনিবেশ করা। একজন মুজাহিদের তো এমন হওয়া উচিত যে, যদি খালি হাতেও কখনো লড়তে হয় তাহলেও তিনি যেন শত্রুর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হন।

জিহাদের এই তারবিয়াতকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

ক. খালেস মানসিক তারবিয়াত

এতে এমন তারবিয়াত দিতে হবে যেন একজন মুজাহিদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, বীরত্ব, গ্রহণযোগ্যতা ও গাম্ভীর্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে।

সে যেন উদ্ভুত সকল পরিস্থিতিকে মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে সক্ষম হয়। কখনো যেন সে কোন পরিস্থিতির দরুন মারতে গিয়ে জিহাদের

পথ থেকে ছিটকে না পড়ে। সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, একজন মুজাহিদকে মানসিকভাবে এমন মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরে প্রাণ বাকী থাকে, ততোক্ষণ সে কোন অভ্যন্তরীণ তত্ত্ব ও তথ্য ফাঁস করবে না। আর কাজ করতে পারুক বা বেশি করতে পারুক, এই পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

খ. শারীরিক ও অস্ত্রপাতির প্রশিক্ষণ

প্রত্যেক মুজাহিদ শারীরিকভাবে এমন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে– খোদা নাখাস্তা, কখনো কাফিরদের ফাঁদে ধরা পড়লে তারা মারপিট করেও যেন কোন প্রকার তথ্য বের করতে সক্ষম না হয়। এমন প্রশিক্ষণ নিবে প্রয়োজনে অস্ত্র ছাড়াও যেন কাফিরদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। শারীরিক ও মানসিকভাবে একজন মুজাহিদ সব সময় থাকবে হৃষ্ট-পুষ্ট।

অস্ত্র-সস্ত্রেরও এমন প্রশিক্ষন থাকবে, যেন প্রত্যেকটি মুজাহিদ সকল আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। যে কোন অস্ত্র যেন চালাতে পারে তার পূর্ণ হক আদায় করে। প্রয়োজনে প্রত্যেকটি মুজাহিদ যেন বাজারে সহজ লভ্য বস্তু দিয়ে বানাতে সক্ষম হয় সাধারণ অস্ত্রপাতি, মেরামত করতে সকল ধরনের অস্ত্র। প্রত্যেক মুজাহিদকে একথা মনে রাখা চাই যে, উম্মাহর হিফাজতের জন্য যেমন জিহাদ ফরয, তেমনি জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাও ফরয। কুরআনে মজীদ বলেছে সাধ্য মতো সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। খোদ নবীজী (সা.)ও জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জোর তাকীদ দিয়েছেন।

সুতরাং প্রত্যেক মুজাহিদীনে কিরামের উচিত শারীরিক ও মানসিক সব ধরনের প্রশিক্ষণ পূর্ণাঙ্গভাবে করা।

২. আনুগত্য

মুজাহিদের জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো আনুগত্য। অনুগত্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের সাথে সাথে আমীরের আনুগত্য। যেহেতু একজন মুজাহিদের জিহাদ নিজের সত্তা স্বগোত্র কিংবা নিছক নিজের দেশের জন্য নয়, বরং সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর

কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে, এজন্য তার উপর জরুরী হলো প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও তদীয় রাসূল (সা.) এর সুন্নাতের অনুসরণ করবে।

বিজয়ের খুশি সাথীদের শাহাদাতের দরুন প্রতিশোধ গ্রহণের সাত্রতা গনীমতের মালের স্তুপ, ক্ষুৎ-পিপাসার জ্বালা তথা যে কোন অবস্থায়ই আসুক না কেন সর্বাবস্থায়ই মুজাহিদ সে কাজটিই করবে যার নির্দেশ আল্লাহ ও রাসূল (সা.) দিয়েছেন। কোন খাঁটি মুজাহিদ কস্মিনকালেও শরীঅতের খেলাফ করতে পারে না, দেশের কাছে পরাজিত হয়ে নিষ্পাপ শিশু, নিরপরাধ মহিলা, বৃদ্ধ ও অসহায় লোকদের উপর হাত উঠাতে পারে না।

একজন মুজাহিদ থেকে যৌথ মালে কিংবা গনীমতের মালে খেয়ানত করার কথা ধারণাই করা যায় না। বিজয়ের খুশিতে নিরপরাধ লোকের খুন নিয়ে হোলী খেলতে পারে না। কেননা আল্লাহ তাআলার সিপাহীরা জুলুম ও খেয়ানত থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকেন।

মুজাহিদের হাতে হাতিয়ার আসার সাথে সাথেই তার এই অঙ্গীকার করা চাই যে, এই হাতিয়ার ও শক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে ও আমীরের শরীয়াতসম্মত নির্দেশে ব্যবহৃত হবে অন্য কোন পথে নয়। যদি কোন মুজাহিদ আল্লাহ্র হুকুম ও আমীরের শরীঅতসম্মত নির্দেশকে অমান্য করে তাহলে বুঝতে হবে সে প্রকৃত মুজাহিদ নয়। সে এমন ব্যক্তি যার দ্বারা দুশমনদের কম ও দোস্তদের বেশি ক্ষতি হবে। তার আমল তার দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবীর জন্য নয় বরং ধ্বংসের কারণ হবে।

একজন মুজাহিদের জানা থাকা দরকার যে, যে আমীরের শরীআতসম্মত নির্দেশ অমান্য করলো সে যেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করলো। আর এই নাফরমানীর কুপ্রভাব তার জিহাদের নেকীসমুহকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিবে। নাউজুবিল্লাহ!

৩. কৌশল

মুজাহিদের জন্য তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো, কৌশল অবলম্বন। একজন মুজাহিদ চাই সে কমান্ডার হোক, চাই সাধারণ মুজাহিদ– সর্বাবস্থায় কৌশল

অবলম্বন করবে, আন্দাধুন্দা লড়বে না। এমন কৌশল ও হিকমত অবলম্বন করবে, যাতে দুশমনকে বেশির থেকে বেশি লোকসানে পৌছানো যায়, সাথে সাথে নিজের হিফাজতও করা যায়। মুজাহিদীনের উচিত তারা যেন দুশমনদের দুর্বল সাইডগুলো খুঁজে বের করে এবং তাদের গোয়েন্দা ব্যবস্থার শিকড় পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা করে। এতে করে তারা সফল অভিযান চালাতে সক্ষম হবে।

মুজাহিদীনে কিরামের দুশমনদের মেজাজ ও মানসিকতা সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা চাই। যেমন মুশরিকের (হিন্দুদের) মেজাজ হলো, তাদের শত মানুষ মারা গেলেও তেমন দুঃখ হবে না, শত টাকা নষ্ট হলে যতোটুকু কষ্ট হবে। সুতরাং মুশরিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর আঘাত হানতে হবে। মনে রাখবেন, শিরিক মানুষকে নিকৃষ্ট মানসিকতায় পৌছে দেয়। এমনকি মুশরিকরা নিজেরাও নিজেদেরকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানী মনে করে না।

হ্যাঁ, শিরিকের প্রাণ তার পয়সার মধ্যে থাকে। দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নবীজী (সা.) যখন আবূ সুফিয়ান (পরবর্তীতে মহান সাহাবী) এর ব্যবসায়ী কাফেলার গতি রোধ করতে চাইলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বাইরে তাশরীফ আনলেন তখন মক্কার মুশরিকরা তাদের মাল-সম্পদ রক্ষা করার জন্য সর্বস্তরের লোকজন নিয়ে নবীজী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এরপর তাদের যা হবার তাই হলো। আবু জাহেল, উতবা, শাইবার মতো বড় বড় মুশরিক নেতা নিহত হলো এ যুদ্ধে। এতে কোমর ভেঙ্গে গেলো মক্কার মুশরিকদের। আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলা বাঁচাতে এসব মুশরিক নেতা নিহত হলো। অর্থনৈতিক স্বার্থ এতে জড়িত না থাকলে হয়তো এতো নেতা এখানে জমায়েত হতো না। আর মুসলমানদের জন্য এতো বড় বড় মুশরিক নেতাকে খতম করা সহজ হতো না।

পক্ষান্তরে ইয়াহুদীদের কাছে মালের চাইতে তাদের ব্যক্তির গুরুত্ব ও মহাব্বত বেশি। তাদের কোটি টাকা নষ্ট হলে তারা যতটুকু না কষ্টবোধ করে তার চেয়ে বেশি কষ্টবোধ করে দু' চার জন লোক মারা গেলে। অবশ্য

তাদের মধ্যেও সম্পদের লোভ কম নয়। তারপর তাদের কাছে সম্পদের চাইতে একজন ইয়াহুদীর গুরুত্ব ও মূল্য বেশি। এজন্য সেকালে মদীনার বনু কাইনুকা ও বনু নজীর নামক ইয়াহুদী গোত্রদ্বয় স্বীয় মাল-দৌলত ও ধন-সম্পদ বিলীন করে দিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেছে। অসংখ্য অর্থ দিয়ে তাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে নিয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে– তারা অসংখ্য অর্থ দিয়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করতো।

সুতরাং আজকে যদি মুসলমানদের কোন মুশরিক গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ হয় তাহলে যতো বেশি ও দ্রুত তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি করা হবে তারা ততো তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে পড়বে। অপরদিকে ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ হলে যতো দ্রুত তাদের বেশি সংখ্যক ইয়াহুদী খতম করা হবে ততো দ্রুত তারা পরাজয় বরণ করবে।

মুজাহিদীনে কিরামের কাছে কাফিরদের এমন জনশক্তি সম্পর্কে ধারণা থাকা চাই– যাদেরকে তাদের বিবেক বলা হয়। কুরআনে মাজীদ এদেরকে আইম্মাতুল কুফ্‌র তথা কাফিরদের নেতা ও রাহবার বলা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে এমন কিছু বুদ্ধিমান নেতা থাকে, বড় বড় যুদ্ধে যারা বিশেষ ভূমিকা রাখে। মুজাহিদীনে কিরামের উচিত তাদের বেতন ভোগী সেনা বাহিনীর মুকাবিলা করে মুসলমানদের বেশি মানব শক্তি ব্যয় না করে নিজেদের দু' চার জন সাথীর কুরবানী পেশ করে কাফির সর্দারদের কিস্‌সা খতম করে দেয়া। এতে বেতন ভোগী নাপাক সৈন্যরা এমনিতেই পিছু হটে যাবে।

মুশরিক ইয়াহুদী কিংবা মুসলমানদের অন্য যে কোন কুফরী শক্তির প্রধান দুর্বলতা হলো তাদের সকল শক্তির ভিত্তি তাদের কয়েক জন ব্যক্তির উপর হয়। ব্যক্তি পূজায় তারা সব সময়মই সীমা পোরিয়ে থাকে। সুতরাং হাতে গোনা কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিকে ঠিকানা লাগিয়ে দিলে ওদের সকল শান-শওকত ম্লান হয়ে যাবে। তাদের কয়েকজন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী খতম করতে পারলে তারা নিবৃত্ত হয়ে যাবে।

পৃথিবীব্যাপী কেবল মুসলমান এমন একটি জাতি যাদের বড় থেকে বড়রা শহীদ হলে তারা হীন মনোবল হওয়ার পরিবর্তে আরো জেগে উঠে, তাদের

শহীদদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটা তাদের ঈমানের উত্তাল জোয়ার বয়ে আনে। এই নজীরবিহীন অবস্থা কোন জাতির মধ্যে নেই। মোটকথা, সামরিক শাখার লোকদের সবদিকেই কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। আজকে ভারতে জারি স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক সংগ্রামই দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো অদূরদর্শিতা, আরেকটি কারণ হলো, এসব সামরিক গোষ্ঠী শুধু সামরিক ও বেসামরিক লোকদের হত্যা করে চলেছে। এতে সরকার অতোটা পেরেশান নয়। কারণ তাদের জনসংখ্যা বেশি। বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধিই তাদের একটি অন্যতম সমস্যা। গত এক বছরেই তারা পরিবার পরিকল্পনার কাজে ১৬৮০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

সুতরাং এদের কিছু লোক মারা গেলে তাদের কিছু যায় আসে না। এজন্য আঘাত হানতে হবে তাদের অর্থনীতিতে। যদি তাদের অর্থনীতিতে শক্ত আঘাত হানা যেতো তাহলে এ নাগাদ অনেক এলাকায়ই এই জালিম হিন্দুদের জুলুম থেকে মুক্তি পেয়ে যেতো।

সামরিক শাখার বিভাগ সমূহ

এ শাখাকে মজবুত করার জন্য এ কাজগুলো তিনটি শ্রেণীর কাছে বণ্টন করে দিতে হবে সেই তিনটি শাখা হলো– ১. প্রশিক্ষণ শাখা। ২. গোয়েন্দা ও তথ্য সংগ্রহ শাখা। ৩. সামরিক শাখা।

১. প্রশিক্ষণ শাখা ঃ প্রশিক্ষণ শাখায় এমন কিছু লোক নিয়োগ দিতে হবে, যারা শারীরিক ও সামরিক সব ধরনের ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন এবং মানসিকভাবেও যারা প্রস্তুত।

এই শ্রেণী বিভিন্ন দেশে ও এলাকায় জিহাদের দৈহিক, সামরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিবে। সাথে সাথে ট্রেনিংপ্রাপ্তদের পূর্ণ তালিকা এদের হাতে সংরক্ষিত থাকবে। এরা সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের জিম্মাদারদেরও ট্রেনিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

২. গোয়েন্দা ও তথ্য সংরক্ষণ শাখা ঃ এই শাখার লোকেরা অত্যন্ত মজবুত, সুস্থ, চালাক-চতুর নিরভিমান, অভিজ্ঞ এবং উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন হতে

হবে। এদের তাকওয়া আনুগত্য এবং গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকবে না। এরা একেবারে পরিচিতিবিমুখ হবে। এরা ব্যক্তি আক্রোশও রাখবে না।

এই শাখার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কাজ হলো–

ক. শত্রুপক্ষের শক্তি ও তাদের স্পর্শকাতর স্থানসমূহের যথাযথ ধারণা রাখা।

খ. শত্রুর দুর্বল দিকসমূহ সম্পর্কে অবগত থাকা।

গ. শত্রুর মাঝে নিজেদের সমরশক্তি ও রণকৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের ভীতিকর কথা ছড়িয়ে দেয়া।

ঘ. নিজেদের সংগঠনে শত্রুপক্ষের কেউ প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া।

ঙ. সংগঠনের মধ্যে যেন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব না হয় সে ব্যাপারে কঠোর নজর রাখা।

চ. দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে সংগঠনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপের যথাযথ ধারণা রাখা এবং তার সমাধানের কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া।

ছ. বিবিধ।

৩. আমীর নির্ধারণ ঃ

সামরিক শাখার কাজ করার জন্য একজন অভিজ্ঞ আমীর দরকার। যিনি সংগঠনের পূর্ণ আনুগত্য করব। সাথে সাথে সাথীদেরকেও পূর্ণ আনুগত্য শেখাবে। এ শাখার কাজ-কাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানা থাকবে।

জিহাদ ও সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য

মুজাহিদীনে কিরামের একথা কখনো ভোলা যাবে না যে, জিহাদ একটি মহান ইবাদত। আর ইবাদত সেটি যেটি খালেস আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং শরীআতের নির্দেশিত পথে করা হয়। এজন্য মুজাহিদীনকে নিজ নিজ নিয়াতকে সব সময় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য স্থির করবে। অন্তরকে

সর্বপ্রকার অহংকার, বড়ত্ব, লৌকিকতা ও রিয়াকারী থেকে মুক্ত রাখবে যাতে এই মহান ইবাদত সর্বোপরি দোষ-ক্রুটি থেকে নিরাপদ থাকে এবং তা আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা যে ব্যক্তি নিজকে বীর বলার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিবে সে সর্বপ্রথম জাহান্নামে যাবে। এজন্য মুজাহিদবৃন্দ কখনোই নিজের অবদান ও কৃতিত্বের দিকে থাকবে না। কখনোই প্রয়োজন ছাড়া নিজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও অবদানের কথা লোক সম্মুখে আলোচনা করবে না। হ্যাঁ কখনো উৎসাহ প্রদান কিংবা কোন বিষয় বুঝাতে নিজের কোন ঘটনা বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তখনো ঘটনাটিকে বড় করে জিহাদ ও আল্লাহর বড়ত্বকে ফুটিয়ে তুলবে।

যদি কোন মুজাহিদের এই বিশ্বাস স্থির হয়ে যায় যে, সে কোন কিছুই করেনি বরং যা কিছু হয়েছে তা কেবল আল্লাহ্‌র ফজল ও করমে হয়েছে, তাহলে এ ধরনের মুজাহিদের নিয়তে কখনো ক্রুটি আসতে পারে না। যদি কখনো সে নিজের ঘটনার বর্ণনা দেয়, তারপরও তাতে তার অহংকার ও রিয়া আসবে না। বরং এ ধরনের মুজাহিদ স্বীয় ঘটনা বর্ণনা করলে বা বই আকারে ছাপালে তাতেও সে সওয়াবপ্রাপ্ত হবে। কেননা এসব ঘটনা ও বিবরণ অনেক মুসলমানের জিহাদের পথে আমার মাধ্যম হবে এবং জান্নাত প্রাপ্তির ওসীলা হবে। কেননা যদি ঘটনার বর্ণনা দেয়াই রিয়া ও লৌকিকতা হতো তাহলে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও সালফে সালেহীন তাঁদের ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতেন না।

কিন্তু যদি খোদা নাখাস্তা কোন মুজাহিদের নজর নিজের ব্যক্তিত্বের উপর ও স্বীয় অবদানের উপর পড়ে যায় এবং এতে তিনি অহংকার বোধ করেন, নিজকে অভিজ্ঞ, ত্যাগী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মুজাহিদ মনে করে বসেন, নিজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে নানা রকম দাবী-দাওয়া করতে থাকেন, তাহলে তার জন্য ভয়াবহ। এ ধরনের মুজাহিদের ইসলাহ ও সংরক্ষণ জরুরী। এ শ্রেণীর মুজাহিদের ঘটনা বর্ণনার মধ্যে রিয়াকারী ও লৌকিকতা থাকা খুব স্বাভাবিক। এ ধরনের অবস্থায় তার আখিরাতের জন্য ধ্বংসাত্মক। এ জন্য মুজাহিদদের ঘটনা বর্ণনার পূর্বে নিজের নিয়াত ও ঈমান টাকে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় আরেকটি কথা হলো, কোন জিহাদের ময়দানে মুজাহিদের হাতে অস্ত্র এসে যাওয়া বিরাট নিয়ামত। এ জন্য শয়তান এই নিয়ামতের অপব্যয়ের জন্য বিভিন্ন রকম ধোঁকা দিতে থাকে। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখবে এই অস্ত্র যদি আল্লাহ্র হুকুম ও নবীজী (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা হবে ইবাদত ও রহমত। আর যদি তা ইচ্ছাধীন ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা হবে ফিতনা ও সন্ত্রাস। আল্লাহ তাআলা জমিন ফাসাদকারীদেরকে ঘৃণা করেন।

কিছু লোক আছে যারা ভাসা-ভাসা জ্ঞান রাখে এবং সামরিক জযবার কাছে পরাজিত শয়তান এদের মনে বিভিন্ন রকম ধোঁকা দেয়। এদের কাছে সুশৃঙ্খল সংগঠনের কর্মকাণ্ড ভালো লাগে না। এরা সংগঠনের ব্যাপারে বলতে থাকে যে, সংগঠনকে তো কোন কাজ করতে দেখিনা।

এ ধরনের লোকের দৃষ্টিতে কোন বিধর্মীর ইবাদতখানা গ্রেনেড নিক্ষেপ করা, কোন সাধারণ সমাবেশ বা মিটিংয়ে ধ্বংসাত্মক কিছু করা কেউ চার্চ উড়িয়ে দেয়া অনেক বড় কাজ। অথচ সংঘটিত একটি আন্দোলন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি পরাশক্তিকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে অজস্র মুসলমানকে সমাজবাদী লাল হায়েনাদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। ভারতের চরমপন্থী হিন্দুদের হাত থেকে ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে রক্ষা করতে অসংখ্য নওজোয়ান প্রাণপণ লড়াই চলছে। এটা তাদের কাছে কিছুই না।

স্থুলবুদ্ধির এ ধরনের নওজোয়ান পৃথিবীর সব জায়গায়ই পাওয়া যায়। এদের কেউ কেউ তো বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা করে এবং কারো আবেগ প্রবণ কর্মকাণ্ড বড় বড় সংগঠনকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। এদের কেউ কেউ উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে এবং বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা নিয়ে উলামায়ে কিরাম ও নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করে পেরেশান করতে থাকে। সাথে সাথে একথাও বলে, জিহাদ নিজ স্থানে ঠিক আছে কিন্তু যদি এ কাজ হক হয়, তাহলে আমরা এতে আছি।

এরা বলে, আপনারা খামোখা অমুকের সাথে লড়ছেন, আসল দুশমন তো আপনার পাশেই রয়েছে। এরা আরো জিজ্ঞাসা করে, "অশ্লীলতা

প্রসারকারী মহিলাদেরকে হত্যা করা যাবে কিনা?" "যে সমস্ত লোক মুজাহিদদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেনা আপনারা অনুমতি দিন, আমরা তাদের মালামাল লুট করে নিয়ে আসি।" আরো বলে– অমুক ব্যাংক অমুক শ্রেণীর লোকেরা চালায়, আমরা লুট করলে দীনের ফায়দা হবে– ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ ধরনের লোকদের সমর্থন কোন আলিম করেন তো না-ই, কোন মুজাহিদের তো এসবের সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রশ্নই উঠে না। মনে রাখা চাই, জিহাদ বলা হয়, যা শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী শরীআতসম্মত পন্থায় ও শরীআত নির্দেশিত স্থানে পরিচালিত হয়। এর বিপরীত যে কোন অভিযানকে বাহ্যত তা জিহাদ মনে হলেও বস্তুত তা জিহাদ নয়।

বিষয়টি আবারো বলবো, এ ধরনের লোককে কখনই প্রশ্রয় দেয়া যাবে না, জিহাদী শক্তিকে অস্থানে ব্যবহার করার অপচেষ্টা চালায় এবং তাৎক্ষনিক ভাবে কিছু করে ফেলার পিছে পড়ে থাকে। এ ধরণের লোকের সাথে জিহাদ কিংবা কোন জিহাদী সংগঠনের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। জিহাদ লুটতরাজ হত্যা, গুম ও সন্ত্রাসের নাম নয়। জিহাদ একটি পবিত্র ইবাদতের নাম, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, আমীরের আনুগত্য ও শরীআতের আলোকে করা হয়।

জিহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সমাজ ব্যবস্থা সংশোধন, জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র জমিনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। জিহাদ হকের দাওয়াতের অপর নাম। এজন্য একজন মুজাহিদের মধ্যে হকের দাওয়াতের জন্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের গুণাবলী থাকতে হবে। আর আজকের পৃথিবীতে যেহেতু সর্বস্তারে ও সকল দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে সেহেতু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই মহান ইবাদত চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখা চাই, জিহাদ জিন্দা রাখা যেমন জরুরী তেমনি প্রত্যেকটি মুজাহিদকে যথাযথ নিরাপত্তার সাথে রাখাও জরুরী। সাময়িক জোশের ঊর্ধ্বে থেকে সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিতভাবে যখন জিহাদী কার্যক্রম চালানো হবে তখন আল্লাহর মদদ ও সাহায্য আসবে এবং

—৭

জিহাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে। ইন্‌শাআল্লাহ এতে কালিমাতুল্লাহ (আল্লাহ্‌র নাম ও আল্লাহ্‌র আইন) বুলন্দ হবে; দীন ইসলাম পৃথিবীতে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্‌র রাস্তার মুজাহিদগণ! জিহাদ মানুষকে মানুষের গোলাম বানানোর মাধ্যম নয়। নিজেদের ইজ্জত, সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যও জিহাদ নয়। দুনিয়া থেকে ফিতনা-ফাসাদ দূর করার জন্য জিহাদ, জিহাদ আখিরাতে সফলতা অর্জনের মাধ্যম। এজন্য যখনই কোন মুজাহিদের হাতে আসলিহা আসবে তখন সে সেটাকে ঈমানী জেওর মনে করবে এবং কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে লক্ষ্য করবে–

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.

অর্থ ঃ এটা আখিরাতের ঘর আমরা তাদের তা দান করবো যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়ত্ব চাইতো না এবং ফাসাদ সৃষ্টি করতো না। আর উত্তম পরিণাম পরহেজগারদের জন্য। -সূরা কাসাস

একজন প্রশিক্ষিত মুজাহিদের সামনে হুযুর (সা.)-এর ২৭টি গাযওয়া (জিহাদ), বদর, উহুদ সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর তরবারী চালনা রোম পারস্যের বিরুদ্ধে হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ঈমানদীপ্ত অভিযান এর আদর্শ থাকা চাই। একটিমাত্র কিশোরীর আর্ত চিৎকারের দরুন মুহাম্মাদ বিন কাসিমের (রহ.)-এর সিন্ধু অভিযানের কথা স্মরণে থাকা চাই। একজন অমুসলিম তরুণীর ইজ্জত বাঁচাতে তারিক বিন যিয়াদ (রহঃ)-এর স্পেন অভিযানের স্মৃতি মনে থাকা চাই। তার সামনে থাকা চাই মসজিদে আকসাকে মুক্ত করার জন্য গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী (রহঃ)-এর ক্রুসেড যুদ্ধের কথাও। এমনিভাবে তার সামনে প্রতিভাত হওয়া চাই হিন্দু জালিমদের থেকে মানব সন্তানকে মুক্ত করার জন্য সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহঃ)-এর ভারত অভিযানের কথাটিও।

একজন অভিজ্ঞ মুজাহিদের মনে এ বিষয়টিও থাকা চাই যে, হুযুর (সাঃ) মদীনার মুনাফিকদের সাথে লড়াই করার অনুমতি দেননি। হযরত উসমান

(রা.) এতো বড় সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও অল্প কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে হত্যার নির্দেশও দেননি–

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ সরদার হযরত নবী করীম (সাঃ) যখন কোন মুজাহিদ বাহিনী কোন অভিযানে প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে নিম্নোক্ত উপদেশগুলো দিতেন।

যাও আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, আল্লাহ্‌র রহমতের সাথে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দীনের উপর কায়িম থেকে। কোন বৃদ্ধ, অপারগ ব্যক্তিকে হত্যা করবে না; দুগ্ধপায়ী বাচ্চাকে মারবে না, ছোট বাচ্চা ও মহিলাদেরকেও হত্যা করবে না। গনীমতের সম্পদেরও খিয়ানত করবে না। (বণ্টনের পূর্বে) গনীমতের মাল এক স্থানে জমা করবে। পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। কখনো এসব শব্দ বলতেন– কারো সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করবে না, কারো (শত্রুর) নাক, কান কাটবে না। (অর্থাৎ মৃত শত্রুর লাশ বিকৃত করবে না) এবং কোন বাচ্চাকে হত্যা করবে না।

এ কথাও মনে রাখবে হুযুর (সা.) এমন মুসলমানকে জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন যারা একে অপরের উপর তরবারী উঠায়। এ অবস্থায় হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামী হবে। এ কথাও খুব মনে রাখবে, একটি প্রাণ আল্লাহ্‌র কাছে খুবই মূল্যবান। এজন্য সাধারণ সন্দেহ ও গোয়েন্দাগিরির সন্দেহে কাউকে হত্যা করবে না। কেননা যখন অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তখন পৃথিবী কেঁপে উঠে এবং আল্লাহ্‌র রহমত বন্ধ হয়ে যায়।

উম্মাহর মহান জানবাজ ভাইয়েরা! জান্নাতের উপযুক্ত বুন্ধরা! জিহাদের ময়দানের নওযোওয়ানরা! ভালোভাবে মনে রাখবেন, আপনার জিহাদ কোন গোত্র, সংগঠন কিংবা কোন গ্রুপের জন্য নয়। আপনারা কোন গোত্রের বিজয়ের জন্য লড়ছেন না। আপনাদের জিহাদ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য।

এজন্য এ লড়াইকে জিহাদ বলা হবে।

আপনারা ইসলামের ইজ্জত বৃদ্ধি ও মুসলমানদের হিফাজতের জন্য জানের নজরানা পেশ করেছেন। এজন্য আপনাদের পায়ের মাটিও জান্নাত

প্রাপ্তির মাধ্যম। আপনারা কুরআনে কারীমের সম্মান বৃদ্ধি ও আল্লাহ্‌র নাম বুলন্দ করার মাধ্যমে বিশ্ব মানবতাকে সফলতার শিখরে আরোহণ করানোর চেষ্টা কুশেশ করে যাচ্ছেন। আপনারা মানুষকে মানুষের গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র গোলামী ও বন্দেগীর পথে নিয়ে আসছেন। আপনারা বড়ই সৌভাগ্যবান।

আপনারা এমন খোশনসীব যারা নিজের রক্তের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও ইসলামের হক্কানিয়াতের সাক্ষী দেয়। এজন্য আপনারা নিহত হলে শাহাদাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। সুতরাং এক কদমও ইসলামের বিপক্ষে ও শরীআতের পরিপন্থী কাজে অগ্রসর হওয়া সমিচীন নয়। আপনাদের কোন কোন পক্ষপাতিত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার উপায় নেই। মনে রাখবেন, আপনারা ইসলামের রাস্তার মুজাহিদ, ইসলামের সেনাবাহিনী, আল্লাহ্‌র দীনের দায়ী এবং হিফাজতকারী। এই সম্মান ও পুঁজি উভয় জগতেই আপনাদেরকে রক্ষা করতে হবে।

জিহাদের সম্ভাব্য পরিণতির জন্য মানসিক প্রস্তুতি

জিহাদ করতে বা কোথাও জিহাদের পর বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন দেশ জয় হওয়ার পরপরই যে সেখানে ইসলামী হুকুমত কায়িম হবে, এটা জরুরী নয়। এজন্য মানসিকভাবে সবধরনের পরিস্থিতিতে নিজকে সামলে নিতে ও পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত রাখতে হবে।

রাশিয়ার সাথে আফগানীদের জিহাদের কথাই ধরা যাক। জিহাদের পরপরই কিন্তু সেখানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং মুজাহিদীনে কিরামের অনুসারীগণ জড়িয়ে পড়েন গৃহযুদ্ধে। এক পর্যায়ে তালিবানের রূপ নিয়ে নিঃস্বার্থ মুজাহিদান কায়িম করেন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত। সুতরাং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিকে মুকাবিলা করতে হবে। চূড়ান্ত যুদ্ধের পর পরস্পরে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কিংবা দলের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যাওয়া খুবই দুঃখজনক বিষয়। এতে মুসলমানদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয় না।

مجاہدین کے اوصاف
মুজাহিদের
গুনাবলী

مُجاھدین
کے اوصاف
ایمانِ کامل
اتباعِ سنّت
ذکر و نوافل
رحماءُ بینہم کا مصداق
اطاعتِ امیر
مجاھد کا آئینہ

মুজাহিদীনের গুণাবলী

পূর্ণাঙ্গ ঈমান :

কুরআনে কারীমে ঈমানদারদেরকে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। কেননা জিহাদের বুনিয়াদই হলো ঈমান। আর জিহাদের মতো মহান ইবাদতকে ঈমানদাররাই যথাযথ করতে পারে। বস্তুতঃ খোদ জিহাদও ঈমানের পূর্ণতার জন্য এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের একটি মাধ্যম।

ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন মজবুত ও শক্তিশালী ঈমান, যা হৃদয়ের গহীনে প্রেথিত এবং যার মিষ্টতা ঈমানদারের রগ ও রেশায় বহমান। এমন ঈমান, যার প্রভাব ব্যক্তির ইবাদত, মুআমালাত (লেনদেন), মুআশারাত (আচার-আচরণ) ও আখলাকের উপর পূর্ণ মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে যাকে। এমন ঈমান আদৌ উদ্দেশ্য ও কাম্য নয়, যার নূর জ্বলতে নিভতে থাকে এবং সে ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার শক-শোবা ও সন্দেহে হাবুডুবু খেতে থাকে। অহরহ। আর তার মুআমালাত মুআশারাত ও আখলাকে তার ঈমানের কোন প্রভাব দেখা যায় না। ঈমান তো এমন এক নিয়ামত যা ঈমানদারের প্রত্যেক কথা ও কাজে প্রকাশ পাবে। একজন মুমিনের চিন্তা-চেতনা আলখাক চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, ইচ্ছা-এরাদা, লেনদেন সব কিছুই ঈমানের জ্যোতিতে জোতির্মান হবে। একজন মুমিন আল্লাহ্‌র একত্ববাদের স্বীকৃত শুধু মুখে দিয়ে ক্ষান্ত হয় না। বরং মানসিক দৈহিক সব দিক দিয়েই তা স্বীকার করে। এজন্য তার সকল কর্মকাণ্ড একজন বেঈমান ও মুশরিকের কাজ কাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়।

তার অন্তরে আল্লাহ্‌র মুহাব্বত ও ভালোবাসা স্থান করে নেয় এবং দুনিয়ার তুচ্ছতা ও নীচতা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। তার জীবন-মরণ সবই হয়ে যায় একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য এবং সে কেবল আল্লাহকেই তার সকল সমস্যার সমাধানকারী মনে করতে থাকে।

আখিরাতের বিশ্বাস ঈমানদারদের অন্তর থেকে পৃথিবীর অনেক বস্তুর ভালোবাসাকে দূরীভূত করে দেয়। এই বিশ্বাস তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান করে তোলে। কারণ একজন ঈমানদার মনে করেন, দুনিয়ার জিন্দেগী আখিরাতের তৈরির জন্য এমন একটি সুযোগ, যদি কেউ তা হেলায়-খেলায় খুইয়ে ফেলে তাহলে আফসোসের সীমা থাকবে না। এই সুযোগ জীবনে একবারই লাভ হয়। সুতরাং এর যথাযথ মূল্যায়ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আল্লাহ্‌র জাত ও সিফাতের উপর বিশ্বাসের পর রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হলো, এমন এক সফল ব্যক্তির উপর ঈমান আনা যার বিশ্বাস ঈমানদারকে ঈমানের ভালোবাসার সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। যার প্রত্যেকটি কথা ও কাজে দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এ মহান সত্তা [নবীজী (সা.)] মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল পথ-প্রদর্শন করেছেন। তাঁর আদর্শ এমন, কোন ঈমানদারকে অন্য কোন আদর্শের দিকে ঝুঁকতে হবে না।

এই মহান ব্যক্তি [প্রিয়নবী (সা.)] মানুষের পারিবারিক জীবন থেকে নিয়ে জীবনের সর্বোচ্চ জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ের রাহনুমায়ী করেছেন। ইতিহাস সাক্ষী, তাঁর আদর্শের অনুসরণ করে আইয়ামে জাহেলিয়াতে একদল মানুষ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও অনুস্মরনীয় মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর সাহচর্যের দরুন একজন মেষ চালক ক্ষমতার মসনদে পর্যন্ত বসতে সক্ষম হয়েছিলেন। সফল ও কৃতকার্য হয়েছিলেন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে। অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে আছে যারা আজো। যাদের কাছে সে সময়ের পরাশক্তি গুলো সবদিক দিয়ে পরাজিত হয়ে তাদের পদানত হয়েছিলো।

হুযুরে আকরাম (সা.) এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জামাআত হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর ঈমান আমাদের জন্য নমুনা ও উদাহরণ। মুজাহিদীনে কিরামকে এজন্য পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে যে, তাদের ঈমান যেন সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর ঈমানের মতো হয়। তাদের ঈমান সাহাবায়ে কিরামের

ঈমানের সাথে যতোটুকু সাদৃশ্য হবে, ততোটুকু তাদের জিহাদ ও অন্যান্য আমলের মধ্যে রূহানিয়্যাত ও নূর পাওয়া যাবে।

হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ ঈমানের আকৃতি ও প্রকৃতির পূর্ণচিত্র তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও দার্শনিক মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)। আমরা মাওলানার শব্দেই বিষয়টির উদ্ধৃত দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন– এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর ঈমানের পরিপূর্ণতার কাজ চলতে থাকে। কুরআন ধারাবাহিকভাবে তাঁদের হৃদয়কে ঐশী নূরে নূরান্বিত করতে থাকে। নবীজী (সা.)-এর সাহচর্য তাঁদের মানসিক হিম্মত, প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সত্যিকার অন্বেষণ এবং তাঁর পথে নিজের সর্বস্ব বিলীন করার মানসিক যোগ্যতা তৈরি করতে থাকে।

তাঁরা আনন্দ ও অবসাদে সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করেছেন। যে অবস্থায় থাকতেন আল্লাহ্র রাস্তায় তাঁর ডাকে সাড়া দিতে বেরিয়ে পড়তেন। এরা প্রিয়নবী (সা.)-এর সাথে জিহাদের ময়দানে ২৭ বার বের হয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশে পূর্ণ উদ্দমে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ১০০ বারেরও বেশি সময়ে। তাঁদের জন্য দুনিয়াবিমুখতা খুব সহজ হয়ে গিয়েছিলো। নিজেদের সন্তানদের উপর কষ্ট-ক্লেশ হয়ে গিয়েছিলো তাদের নিত্য দিনের সাথী।

কুরআনে কারীম এমনতর নিত্য নতুন বিধানাবলী নাযিল করে, যা তাঁদের কাছে একেবারে নতুন ছিলো। জান-মাল, সন্তান-সন্তুতি, বংশ প্রতিবেশীর ব্যাপারে কখনো এমন বিধান আসতো, যা সবার জন্য মানা সহজ ছিলো না। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের মহান জামাআত নবীজী (সা.)-এর সকল কথা ও নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতে প্রস্তুত ছিলেন। নবী কারীম (সা.) তাদের ঈমান আনয়নের জন্য একবার প্রাণপণ কুশেশ করেছেন, এরপর আমল করার সকল শ্রম ও ত্যাগ তাঁরা সেচ্ছাপ্রণোচিত হয়েই দিয়েছেন। ইসলাম ও জাহিলিয়াতের এই লড়াইয়ে ইসলাম যখন জাহিলিয়াতকে জয় করেছে তখন আর প্রতিটি ঘাটে লড়াইয়ের প্রয়োজন বাকী থাকেনি। দিকে দিকে লোকেরা

তাঁদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততিসহ সর্বস্ব নিয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে সমবেত হতে লাগলেন। তাঁদের সামনে যখন সত্য প্রকাশ পেয়ে গেলো, তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাপারে তাদের আর কোন সংকোচ থাকলো না। যে ব্যাপারে প্রিয়নবী (সা.) কোন সিদ্ধান্ত দিতেন, সে ব্যাপারে তাদের আর কোন রকম আপত্তি থাকতো না।

এঁরা সামনে নিজেদের দোষত্রুটি নিদ্বির্ধায় স্বীকার করতেন। যদি তারা বড় কোন গুনাহ করতেন, তাহলে হক কায়িমের জন্য নিজেদেরকে পেশ করতেন। যখন মদ হারাম হলো, তো তারা আল্লাহ্র নির্দেশকে নিজেদের নেশার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ফেলেছেন হাতের পেয়ালাটুকুও। মদীনার অলি-গলি মদের বন্যা বয়ে গেলো।

যখন তাঁদের অন্তর থেকে জাহেলী যুগের শয়তানের প্রভাব কেটে গেলো; বরং এমন বলা যেতে পারে যে যখন তাদের অন্তর থেকে পাপ-পঙ্কিলতার কালিমা অন্তর থেকে মুছে তোলেন, তখন তারা অতিমানবে পরিণত হলেন। পৃথিবীর বিষয়ের উপর আখিরাতের বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করতে লাগলেন। বিপদ-আপদে ও মুসীবতে নিজকে রাখলেন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর; আর অধিক রহমত পেলেও উশৃঙ্খল হতেন না।

ব্যবসা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকির থেকে কখনোই গাফিল করতো না। কোন অশুভ শক্তির কাছে করতেন না মাথানত। কোন রকমের অতিরঞ্জনের ধারণাও তাদের অন্তরে সৃষ্টি হতো না। বলতে হবে মানুষের জন্য তাঁরা সত্যের মাপকাঠি। তাঁরা ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী। যদিও কখনো তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হতো, তবু তারা সত্য প্রকাশে পিছপা হতেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে তাদের পদানত করে দিলেন। তারা এ সময় অবতীর্ণ হলেন দীন ও দুনিয়ার রক্ষক হিসাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানাতেন এবং তিনি নিজ চোখে উম্মাতের এই মহান জামাআতকে শীতল নয়নে অবলোকন করে মহান প্রেমিক আল্লাহ্র দরবারে হাজিরা দিলেন। -মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো উর্দূ প.- ৯৯-১০০

হুযুরে আকরাম (সা.) মহান ও ভাবগম্ভীর বাণী মুবারকে ঈমানের ৭০ -এর চাইতে অধিক শাখা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বাইহাকী (রহ.) এসব শাখা স্বীয় কিতাব শু'আবুল ঈমানে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে মুজাহিদীনে কিরামের জন্য সে সব শাখা সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করছি। যাতে এ সবের উপর আমলের সুযোগ হয় এবং এ ব্যাপারে তাঁরা যত্নবান হয়। কারণ এতে ঈমান মজবুত হবে।

এসব শাখার মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো ব্যতীত ঈমানদারই হওয়া যায় না। আর কিছু এমন রয়েছে যেগুলো দ্বারা ঈমানে পূর্ণতা আসে, ঈমান হয় সহীহ্ ও সঠিক। এসব অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়া চাই এবং দেখা চাই কোনগুলো আমাদের মধ্যে রয়েছে আর কোনগুলো নেই?

১. লা-ই লাহা ইল্লাল্লাহু তথা আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই– একথার মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া। ২. সমস্ত নবী ও রাসূলের স্বীকৃতি দেয়া। ৩. সকল ফিরিশ্‌তাকে মানা। ৪. সকল আসমানী কিতাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ায় বিশ্বাস রাখা। ৫. তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় (এ কথার ইয়াকীন রাখা)। ৬. কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস ৭. মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়া সত্য বলে জানা ৮. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরযিয়াত (বলে স্বীকার করা) ৯. যাকাতের ফরযিয়াত করা। ১০. রমযান শরীফের রোযার ফরযিয়াত। ১১. হজ্জের ফরযিয়াত। ১২. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্। ১৩. কবর থেকে উঠানোর পর মানুষের হাশর। ১৪. জান্নাত ঈমানদারদের জন্য এবং দোযখ কাফিরদের জন্য খাছ হওয়া। ১৫. আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার আবশ্যকতা। ১৬. আল্লাহ্‌কে ভয় করার আবশ্যকতা। ১৭. আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখা। ১৮. আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা রাখা। ১৯. নবীজী (সা.)-এর ভালোবাসার আবশ্যকতা। ২০. প্রিয়নবী (সা.)-এর তাজীম ও তাকরীম ওয়াজিব হওয়া। ২১. দীনের সকল বস্তুকে প্রিয় মনে করা। ২২. ইলমে দীন অর্জন করা। ২৩. ইলমে দীনের তাবলীগ ও তা মানুষের মধ্যে প্রচার-প্রসার করা। ২৪. কুরআনের তাজীম। ২৫. পবিত্রতা অর্জন জরুরী হওয়া। ২৬. ইতিকাফ। ২৭. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের প্রহরা। ২৮. শত্রুর সামনে মুকাবিলার সময় দৃঢ়পদ থাকা। ২৯. গনীমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হাকিমকে প্রদান। ৩০. দাস মুক্ত করা। ৩১. কাফ্‌ফারাসমূহ আদায় করা।

৩২. অঙ্গীকারপূর্ণ করা ৩৩. আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা। ৩৪. অনর্থক ও বেহুদা কথা থেকে জবানের হেফাজত করা। ৩৫. আমানত রক্ষা করা। ৩৬. অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা হারাম হওয়া। ৩৭. লজ্জা স্থানের হেফাজত। ৩৮. অবৈধ পন্থায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা। ৩৯. হালাল খাওয়া। ৪০. পুরুষের জন্য রেশমের কাপড় পরিধান করা স্বর্ণ-রূপার থালা-বাসন হারাম হওয়া। ৪১. শরীআত পরিপন্থী খেলাধুলা হারাম হওয়া। ৪২. মিতব্যয়ী হওয়া। ৪৩. হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বাঁচা। ৪৪. ইজ্জত-আব্রুর সম্মান প্রদর্শন। ৪৫. ইখলাসের আমল ও রিয়া থেকে বাঁচা। ৪৬. নেককাজ করলে খুশি হওয়া এবং বদ কাজ হয়ে গেলে অনুতপ্ত ও অসন্তুষ্ট হওয়া। ৪৭. গুনাহ থেকে তাওবাহ। ৪৮. কুরবানী করা। ৪৯. উলিল আমরের (শরয়ী বিচারকদের) আনুগত্য করা। ৫০. সংঘবদ্ধ জীবন যাপন অবলম্বন করা (উম্মাত থেকে ভিন্ন হওয়া থেকে বাঁচা) ৫১. ন্যায় ও ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা। ৫২. নেক কাজ করা, অসৎ কাজ থেকে বাঁচা (আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার করা)। ৫৩. নেক ও তাকওয়ার কাজে সহায়তা। ৫৪. লজ্জা ও শরম। ৫৫. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার। ৫৬. আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক। ৫৭. দাস তার মালিকের সাথে ভালো আচরণ। ৫৮. মালিকের উচিত তার গোলামের সাথে ভাল আচরণ করা। ৫৯. সদাচরণ। ৬০. সন্তান-সন্তুতির হক আদায়। ৬১. দীনী ভাইদের সাথে মহব্বত ও ভালোবাসা। ৬২. সালামের জবাব দেয়া। ৬৩. রোগীর খোঁজ খবর। ৬৪. মুসলমানদের জানাযায় শরীক হওয়া। ৬৫. হাঁচির জবাব দেয়া। ৬৬. কাফির ও ফিতনাবাজদের থেকে দূরে থাকা। ৬৭. সমবয়স্কদের ইজ্জত সম্মান। ৬৮. মানুষের গুনাহসমূহে পর্দা প্রদান। ৬৯. মেহমানদের সম্মান ইজ্জত করা। ৭০. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ ৭১. যোহদ অবলম্বন করা এবং আশা-ভরসা সংক্ষিপ্ত রাখা। ৭২. বাইয়াত (ব্যক্তিত্ব বোধ) ৭৩. বেহুদা ও অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকা। ৭৪. বদান্যতা। ৭৫. ছোটদের স্নেহ ও বড়দের ইজ্জত। ৭৬. পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন। ৭৭. নিজের মুসলমান ভাইদের জন্য তাই পছন্দ করা যা নিজের জন্য পছন্দ করা হয়।

আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে উল্লেখিত সকল বিষয়ের উপর ইয়াকীন রাখার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইত্তিবায়ে সুন্নাত

একজন মুজাহিদকে তাঁর পূর্ণ জীবনটাকে নবীজী (সা.)-এর তরীকা মুতাবিক গঠন করা চাই। মুজাহিদদের বেশ-ভুষা, উঠা-বসা, পানাহার, নিদ্রা, জাগরণ তথা সকল আমল ও কর্মকাণ্ড সুন্নাতের নূরে নূরান্বিত হওয়া চাই।

হুযুরে পাক (সা.) তাঁর ইন্তিকালের সময় উম্মাতের জন্য দুটি বস্তু রেখে গেছেন। যদি আমরা সেই দুটি বস্তু শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে পারি তাহলে গোমরাহী থেকে রক্ষা পাবো। সেই দুটি বস্তু হলো কুরআন মজীদ ও নবীজী (সা.)-এর সুন্নাহ।

নবী করীম (সা.) স্বয়ং এই সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরতে এবং তার উপর আমল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন এই ফিতনার যুগে সুন্নাহ মানার গুরুত্ব আরো অধিক। তাজ্জবের বিষয়, আজকে উম্মাহ এমন সব অথর্ব লোকের অনুসরণ করছে এবং এমন সব লোককে আদর্শ মনে করছে যাদের গণনা "গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম এবং ওয়াদ্দ্ব-ল্লীন" এর করা হয়। অর্থাৎ যারা ইয়াহুদ ও নাছারা। মনে রাখবেন, আমরা কিন্তু প্রত্যেক নামাযে এদের দলভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাচ্ছি।

হুযুর (সা.)-এর সেই ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে আজকের সমাজের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রিয়নবী (সা.) বলেছিলেন, তোমরা ইয়াহুদ ও নাছারার এমন অনুসরণ করতে শুরু করবে, যদি তারা গুই সাপের গর্তেও ঢুকে, তোমরাও তাদের পিছে সেই গর্তে ঢুকে পড়বে।

সর্বযুগেই সুন্নাতের অনুসরণ দীন ও দুনিয়ার সফলতার চাবিকাঠি। কিন্তু এই ফিতনা-ফাসাদের যুগে নির্দিষ্ট করে করে এক একটি সুন্নাত জিন্দা করা চাই এবং হুযুর (সা.)-এর চরিত্র এবং অভ্যাসেরও অনুসরণ করার পূর্ণ চেষ্টা করা চাই। এমনিভাবে হুযুর (সা.)-এর প্রিয় বস্তুসমূহকে প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্তুসমূহকে অপ্রিয় করে নেয়া চাই।

হুযুর আকদাস (সা.) যেসব বস্তুকে অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন তা অনুসরণের প্রাণপণ পাবন্দি এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাকার জানতোড় মেহনত করা চাই।

একজন মুজাহিদের জন্য তো এমনটি হওয়া চাই যে, তার আমল দেখে মানুষেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতসমূহ শিখতে পারে। একজন মুজাহিদ যখন জুতা পরবে, মাথা আঁচড়াবে, মসজিদে প্রবেশ করবে, মসজিদ থেকে বের হবে, কারো সাথে কথা বলবে, কাউকে কোন কিছু বুঝাবে, দুশমনের সাথে লড়াই করবে, পারিবারিক কোন কাজ করার অথবা যৌথ কোন কাজে মশগুল থাকবে তখন এসব কাজ যেন সম্পূর্ণ সুন্নাত মুতাবিক হবে। হ্যাঁ, একজন মুজাহিদের সকল ইবাদত ও লেনদেন সুন্নাত তরীকা অনুযায়ীই হতে হবে।

জিহাদী সংগঠনগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুন্নাত জিন্দা করার কাজ করা চাই। নেতৃবৃন্দ সদস্য ও সাধারণ সাথীদেরকে একটি একটি করে সুন্নাত লেখানো চাই। কেননা এই সুন্নাত জিন্দা করা এমন একটি প্রিয় কাজ, যদ্দরুন আল্লাহ্‌র রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে। আবার দু' একটি সুন্নাত ছুটে গেলে আল্লাহ্‌র রহমত বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

যেমনিভাবে একজন মুজাহিদ জেহাদের মাধ্যমে দীনের হিফাজত করে, তেমনিভাবে একজন মুজাহিদ স্বীয় আমালের মাধ্যমে এক একটি সুন্নাত জিন্দা করবে। কেননা, এই মুবারক আমলের মাধ্যমে তার আত্মা প্রাণ খুঁজে পাবে এবং মুসলিম উম্মাহও পাবে আত্মার সঞ্জীবনি শক্তি।

মুজাজিদদের মধ্যে সুন্নাতসমূহ জিন্দা করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

(১) নির্দিষ্ট একটি দিন যৌথভাবে দৈনন্দিন জীবনের সন্নাতসমূহ মুখস্থ করা ও করানো যেতে পারে। ইবাদত ও আদত সর্বস্থানে নবীজী (সা.)-এর সুন্নাতসমূহ অবলম্বন করার উপর জোর বয়ান করতে হবে। সাথে সাথে মাসনূন দুআসমূহ শিখতে ও শেখাতে হবে।

(২) মাঝে মধ্যে ব্যাপক আকারে অনুষ্ঠান করে মজমার মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে যে, কোন সাথী কতোটুকু সুন্নাতের উপর আমল করবে এবং কার কয়টি মাসনূন দুআ মুখস্থ রয়েছে। কোন দুর্বলতা পাওয়া গেলে তা পূর্ণ করার কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

(৩) সেসব কিতাবের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত তালীমের ব্যবস্থা করতে হবে যেগুলোতে নবীজী (সা.)-এর সুন্নাতের আলোচনা রয়েছে এবং মাসনূন দুআও রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষ করে শামায়িলে তিরমিযীর উর্দূ অনুবাদ 'খাসাইলে নববী, অনুবাদক শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.), অনুবাদ ও টীকাসহ হিসনে হাসীন, অনুবাদক মাওলানা ইদরীস সাহেব (রহ.), 'আলাইকুম বিসুন্নাতী' হযরত মাওলানা আব্দুল হাকীম মিখ্খারবী (রহ.), অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করা যেতে পারে। এছাড়াও কোন গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ এ ব্যাপারে পাওয়া গেলে তা অধ্যয়ন করা চাই।

(৪) মুজাহিদরা ছোট্ট একটা চামড়ার ব্যাগ রাখবে, যাতে মিসওয়াক, সুরমা, চিরুনী, আতর, সুঁই, সুতা ইত্যাদি রাখবে। বাজার থেকে গ্রহণযোগ্য লেখকের একটি পকেট সাইজ মাসণূন দু'আর কিতাব সংগ্রহ করে তা কাছে রাখবে। এসব দু'আ শিখে নির্দিষ্ট স্থানে পড়ার ইহতেমাম করবে।

কুরআনে কারীমের একটি ছোট কপিও রাখবে নিজের কাছে। এতে করে তিলাওয়াতের নাগা হওয়ার সুযোগ থাকবে না। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) অথবা হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর তরজমাকৃত সাইজে ছোট কুরআন শরীফ যদি পাওয়া যায় তাহলে সেটির একটি কপি রাখবে কাছে। এতে করে তিলাওয়াতের সাথে সাথে সুযোগ মতো তরজমাও দেখে নিবে। হ্যাঁ, এই ব্যাগটি যদি কখনো সন্দেহের কারণ হয় তাহলে কিন্তু তা সাথে রাখবে না।

(৫) বিভিন্ন সময় সাংগঠনিক পরীক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে সুন্নাতের পরীক্ষাও গ্রহণ করবে। এতে নবীজী (সা.)-এর সুন্নাত মানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

(৬) মুজাহিদীনে কিরামের সাপ্তাহিক ও মাসিকীগুলোতে সুন্নাতের আলোচনা ও মাসনূন দুআও থাকবে। এতে পাঠকদের ফায়দা হবে।

যিকির ও নফল

এক রোমান নেতা হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর প্রশংসা এভাবে করেছে–

"তাঁরা ছিলেন দিনের ঘোড়-সওয়ার আর রাতে ইবাদতগুজার। তাঁরা নিজেদের বিজিত এলাকায়ও খানা কিনে খেতেন, সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন এবং এমন দৃঢ়ভাবে জিহাদ করতেন যে, দুশমনদেরকে খতম করেই কেবল ক্ষান্ত হতেন।"

তাঁদের আরেকজন এভাবে পরিচয় করিয়েছেন– "রাতে তাঁদেরকে দেখবে তো মনে হবে যেন দুনিয়ার সাথে তাঁদের কোন সম্পর্কই নেই এবং ইবাদত ছাড়া তাঁদের কোন কাজ নেই। আর দিনের বেলায় এমনভাবে সওয়ার দেখতে পাবে যেন এটাই তাদের কাজ।" ভীষণ তীরন্দাজ, ঝানু নেজাবাজ; আল্লাহ্‌র যিকিরে এমন মশগুল থাকতেন যে, তাঁদের মজলিসে কথার আওয়াজ শোনাই মুশকিল হয়ে যেতো।

-সূত্র-মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো, উর্দূ পৃ,- ১৪২

এটা হলো হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর ইবাদতের একটি ঝলক, যার স্বীকৃতি তাঁদের বন্ধুরা নয়, শত্রুরা দিয়েছেন। তাঁদের এ ধরনের গুণাবলীই তাঁদেরকে সকল ময়দানে আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রাপ্তির হকদার বানিয়ে দিতো এবং তাঁরা নিজেদের চাইতে বিশগুণ বেশি শক্তিধর দুশমন খোদার ফজলে পরাজিত করতে সক্ষম হতেন। আর এসব জিন্দা গুণাবলীর দরুন তাঁদের কদম মুবারক যেখানেই পড়তো সেখানে ইসলামের নূরানী চেরাগ জ্বলে উঠতো এবং কুফুর ও শিরকী জুলমাত দূরীভূত হতো।

আজো পৃথিবীতে এমন মুজাহিদীনে কিরামের প্রয়োজন, যারা নিজেদের ঈমানী শক্তির বলে মজলুম মানবতাকে আশ্রয় দান করবে, কুফরীর নিকৃষ্টতম গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র বান্দাহদেরকে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করার পরিবেশে নিয়ে আসবে। আজো এমন মুজাহিদীন প্রয়োজন, যারা জাগ্রত ঈমানের অধিকারী; যাদের রাত আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাহরত অবস্থায় অতিবাহিত হয়; যারা আল্লাহ্‌র প্রেমে মাতাল চোখের প্রবাহমান পানিতে উজু করে; যাদের রসনা আল্লাহ স্মরণে থাকে জিন্দা।

আজকে ইনসানিয়াতের এমন জানবাজ লড়াকুর প্রয়োজন, যারা না যিকির করে ক্লান্ত হয়; না তলোয়ার চালিয়ে পরিশ্রান্ত হয়। আজ যখন কুফরী শক্তি অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম অর্জন করেছো অথচ মুসলমানরা প্রায় সবাই

গাফলতীর নিদ্রায় নিমগ্ন এবং দায়িত্বহীনতা চরম সীমায় উপনীত তখন বিশ্ব মানবতাকে এই ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য এমন মুজাহিদীনে কিরামের প্রয়োজন, যারা এমনভাবে আল্লাহ্র যিকির করে, যদ্দরুন আসমান থেকে আল্লাহ্র রহমত যমিনের দিকে ধাবিত হয় তারা এমন, যারা জীবনের চাইতে মৃত্যুকে চায় বেশি, যারা বড় শক্তি দেখে প্রভাবিত হয় না। আল্লাহ্র ইয়াকীন তাদের অন্তরে এমনভাবে স্থির হয়ে গেছে যে, গাইরুল্লাহ, এর সম্মানও ইজ্জত ও ক্ষমতা তাদের অন্তর থেকে একেবারে বের হয়ে গেছে। এসব লোকের হৃদয় আল্লাহ্র বড়ত্ব ও তার নূরের আলোতে আলোকিত। জিহাদ ও যিকির অবশ্য একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এজন্য খোদ আল্লাহ্ তাআলা মুজাহিদীনে কিরামকে আল্লাহ্র রাহে দৃঢ় কদম থাকতে ও যিকির করতে বলেছেন। এটাই তাদের কৃতকার্যতার পথ। আজকের প্রেক্ষাপটে যিকরুল্লাহ ও দৃঢ়তার গুরুত্ব অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে; কারণ, এ দুটি বস্তু ছাড়া কুফর তাগুতের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া খুবই কঠিন।

এজন্য মুজাহিদীনে কিরামের এ বিষয়টির প্রতি খুবই যত্নবান হওয়া দরকার, আল্লাহ্র যিকিরে জিহ্বাকে তরতাজা রাখা চাই এবং নফল নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিল করা চাই। মনে রাখবেন, কেবল নফলের মাধ্যমেই বান্দাহ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে। আর আল্লাহ্র যিকিরের মাধ্যমে সে নিজকে আল্লাহ্র সঙ্গী (বন্ধু) বানিয়ে ফেলে।

যখন বান্দাহ আল্লাহ্র যিকির করে তখন মহান আল্লাহ্ স্বীয় রহমত ও বরকত তার উপর বর্ষণ করেন এবং আসমানে ফিরিশতাদের মধ্যে তার আলোচনা করেন যিকিরের মজলিসকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখেন। আর হাদীস শরীফে যিকিরের মজলিসকে জান্নাতের বাগিচা বলা হয়েছে। অপর দিকে সে মজলিস যেখানে আল্লাহ্র যিকির হয় না, সেটি যেন এমন যে, কিছু লোক কোন স্থানে জমায়েত হলো এবং কোন মৃত পশুর গোশ্ত খেয়ে পৃথক হয়ে গেলো। এ ধরনের মজলিস কিয়ামতের দিনে পরিতাপের কারণ হবে। মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তাআলা যতো ধরনের শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলোর সারকথা হলো আল্লাহ্র যিকির ও তাঁর নামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

এ জন্য মুজাহিদীনে কিরামের উচিত, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, ঘুমন্ত অবস্থায় ও জাগ্রত অবস্থায় তথা সার্বক্ষণিকভাবে যিকির করতে থাকবে। আর মাঝে মধ্যে আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসে আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও বড়ত্বের বয়ান শুনবে। খোদ আল্লাহ্ তাআলা প্রিয়নবী (সা.)কে যাকিরীনদের সাথে বসতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم باغداة واعشى

হে নবী! আপনি নিজকে সেসব লোকের সাথে সম্পৃক্ত করুন যারা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ্র যিকির করে। যিকরুল্লাহ তথা আল্লাহ্র যিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্র স্মরণ ও ধ্যান। এই স্মরণ ও ধ্যান, আল্লাহ্র যিকিরের মাধ্যমে হতে পারে, ইস্তিগফারের মাধ্যমে হতে পারে, আল্লাহ্র হামদ ও ছানা করার মাধ্যমে হতে পারে, কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের মাধ্যমে হতে পারে। এমনিভাবে তা দীনী ইলমের শিক্ষাদান ও গ্রহণের মাধ্যমেও হতে পারে। উদ্দেশ্য আল্লাহ্র স্মরণ। তবে এর ধারা হতে পারে বিভিন্ন রকমের।

এজন্য মুজাহিদীনে কিরাম ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতের সাথে সাথে নফলের পূর্ণ গুরুত্ব দান করবে। অতীত সাক্ষী, মুজাহিদরা মুসল্লার এবং ঘোড়ার পিঠের যতোটুকু ইহতিমাম করেছে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের থেকে এতটুকু কাজ নিয়েছেন। সুলতান আলতামাশের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি কখনো আসরের চার রাকাআত সুন্নাত ও তাহাজ্জুদের নামায ছাড়তেন না। মোগল সম্রাট মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আলমগীর (বাদশাহ আলমগীর)-এর দীর্ঘ কিরাআত বিশিষ্ট নামায এবং অসংখ্য রাকাআত নফল নামাযের কথা ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। অথচ এঁরা এতো বড় বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁদের অধীনে বিশাল-বিশাল সাম্রাজ্য। এঁরা সারাজীবন অসংখ্য শক্তিশালী শত্রুর মুকাবিলা করে গেছেন।

এসব রাজা-বাদশাহ বিভিন্ন ধরনের চক্রান্তের মুকাবিলা করেছেন। তাছাড়াও ছিলো তাদের নানা রকম ব্যস্ততা। এতদসত্ত্বেও তাঁরা তাহাজ্জুদের ইহতিমাম করতেন, খুশু-খুজুর সাথে নামায পড়তেন ইশরাক চাশ্তও

পড়তেন গুরুত্ব সহকারে, তিলাওয়াত করতেন প্রতিদিন। এমনকি তাঁরা হিফজ করেছেন কেউ কেউ, লিখেছেন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি। সুলতান গাজী সালাহুদ্দীন আইউবী (রহ.)-এর জীবনী পড়লে মানুষ হয়রান হয়ে যায় যে, কীভাবে তিনি নানা প্রতিকুলতা পেরিয়েও বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে পেরেছিলেন।

এঁরা সবাই আমাদের মতো মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন যে, দুনিয়ার এই জীবনটাকে কোন মতেই নষ্ট করা যাবে না। যা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে একবারই প্রদান করেন। এই জীবন বারবার মিলবে না, এরই মধ্যে দুনিয়ার, আখিরাতের, ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত সকল জিম্মাদারী পূর্ণ করতে হবে। সুতরাং তাঁরা নিজেদের মূল্যবান জীবনটাকে শুধু খানাপিনা, আরাম-আয়েশ ও পারিবারিক জীবনেই শেষ করেননি।

তাঁরাও ঘুমাতেন, তবে তা হতো কেবল প্রয়োজন পরিমাণ। তারা খেতেন তবে তা কেবল প্রাণ রক্ষা পরিমাণ। কখনোই খানাকেই তাঁরা উদ্দেশ্য বানাননি। তাঁরা মনে করতেন "বাঁচার জন্য খাওয়া, খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়।" তারা ঘরোয়া কাজ করতেন, তবে তা হতো অবশ্যই শরয়ী সীমার মধ্যে। তাঁরা তাঁদের ছেলে-মেয়ের বিয়ের পিছনে মাস ও অসংখ্য দিন ব্যয় করতেন না; বরং যথাসাধ্য অল্প সময়ের মধ্যে তা সুসম্পন্ন করতেন সম্পূর্ণ সুন্নাত পদ্ধতিতে এবং সাধাসিধেভাবে।

এসব খোশনসীব লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন; এজন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সময়ের মধ্যে বরকত দান করেছেন। আর তাঁরা আল্লাহ্র এই নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ আরো অধিক পরিমাণে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করেছেন।

তাঁদের একথার ইয়াকীন হয়ে গিয়েছিলো যে, কোন কাজই আল্লাহ্র তাওফীক ও মদদ ছাড়া সম্ভব নয়। এজন্য তাঁরা সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলাকে রাজী-খুশি করার জন্য যিকির, নফল ইবাদত এবং দু'আ ও ইস্তিগফারের প্রতি যত্নবান হন। এরপর তাঁরা যে কাজই করতেন আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সহায় হতেন এবং তা কবুল করে নিতেন।

আজকাল অনেক লোক জামাআতে নামায ছেড়ে দিয়ে দীনের মেহনত করছে। নফল নামায ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কাজে লেগে যান, দুআ ও যিকির ছেড়ে দিয়ে আলোচনা এবং দেখা-সাক্ষাতে লিপ্ত হয়ে যান; তাদের কাজে বিন্দুমাত্রও বরকত হয় না। বরং উল্টা অকৃতকার্যতার মুখ দেখতে হয়। দীনী কাজের নামে যিকিরের মধ্যে অলসতার কুপ্রভাব ও গাফলতির ফিতনা সংশ্লিষ্ট সকলের উপর পড়ে যায়।

মনে রাখবেন, দীনের এমন কোন কাজ নেই, যার জন্য নামায ছাড়া যাবে; আর সে কাজ যার দরুন দীনী ফারায়িয ও ইবাদতের মধ্যে অলসতা এসে যাবে, তা কখনোই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মাধ্যম হতে পারে না।

এজন্য মুজাহিদীনে কিরাম রাতের শেষ অংশে জাগবে। দু' চার রাকাত নামায পড়ে চোখের পানি ফেলে এবং আহাজারি করে নিজের ও উম্মাতের জন্য দু'আ করবে। লম্বা লম্বা সিজদাহ করে আল্লাহ্র সাহায্য ভিক্ষা চাইবে। এভাবে ইবাদতের সাথে সাথে ফরয নামাযের আগে পরে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, গাইরে মুআক্কাদারও ইহতিমাম করবে; একাকী ও যৌথ যিকির করবে, তিলাওয়াতে কালাম পাকের প্রতিও যত্নবান থাকবে।

একজন মুজাহিদের (প্রাথমিকভাবে) ব্যক্তিগত আমল করার একটি নমুনা পেশ করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ! অনেক ভাই এর উপর আমল করে রূহানী ও দীনী অনেক ফায়দা পেয়েছেন। আশা, এটি সকলের জন্য মঙ্গলজনক হবে। নমুনা টি নিম্নরূপ-

১। তাহাজ্জুদ, ইশরাক, আওয়াবীন এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের সাথে সুন্নাতসমূহ ও নফলসমূহের পাবন্দী করুন।

২. প্রত্যেহ এক পারা তিলাওয়াত করুন। এক পারা সম্ভব না হলে কমপক্ষে আধা পারা পড়ুন। আর হাফিজ সাহেবগণকে তিলাওয়াত করতে হবে কমপক্ষে তিন পারা। (এটি কুরআনের বর্ণিত দু'আসমূহের সংকলন)

৩. মুনাজাতে মকবুল-এর সাত মনজিল থেকে প্রতিদিন এক মনজিল পড়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। আর শুক্রবার দুপুরের পূর্বেই সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করুন। এতে অসংখ্য ফযীলত রয়েছে।

৪. প্রথম কালিমা, তৃতীয় কালিমা, দরুদ শরীফ ও ইস্তিগফারের এক তাসবীহ করে পড়ার প্রতি যত্নবান হোন।

৫. প্রতিদিন দু'রাকআত সালাতুত তাওবাহ পড়ে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র কাছে স্বীয় কৃতকর্মের ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সৌভাগ্যবান মুসলমান সে যার আমলনামায় অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার রয়েছে। ইস্তিগফারের দ্বারা শুধু গুনাহ মাফ হয় তা নয়, বরং মর্তবা বুলন্দ হয়, পেরেশানী ও মুসীবত দূর হয়, আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়, অসংখ্য সমস্যা দুর হয় এবং রিযিকের মধ্যেও বরকত হয়।

৬. প্রত্যেক নামাযের পরে এবং অন্যান্য আমলের শুরুতে ও শেষে মাসনূন দু'আসমূহ যত্নের সাথে পড়ুন।

৭. রাতে শোয়ার পূর্বে বিছানায় বসে চক্ষু বন্ধ করুন। এরপর সকাল থেকে ঘুমের আগ পর্যন্ত কোন কাজ করেছেন তার একটা নকশা মাথায় আনুন। উদাহরণত ভোর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়েছেন, কিংবা খোদা নাখাস্তা তাহাজ্জুদ পড়তে পারেননি। অতঃপর ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়েছেন অথবা জামাআতের সাথে পড়তে পারেননি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এভাবে এক দেড় মিনিটে আপনার সামনে সারাদিনের সকল কাজ-কামের চিত্র এসে যাবে। এখন যেসব দুর্বলতা ও কমজোরী রয়েছে, সেগুলো সামনে এনে তার বিহীত ব্যবস্থা নিন। গুনাহ্ হয়ে গেলে খালিছ দিলে তাওবাহ করুন। কাজে কোন প্রকার দুর্বলতা পাওয়া গেলে তা পূর্ণ করার দৃঢ়সংকল্প নিন আর কোন নেক কাজ করে থাকলে সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করুন।

এভাবে করার ফায়দা হলো, প্রতিদিনের গুনাহের জন্য প্রতিদিনই ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ হবে। আশা করি, এতে আল্লাহ তাআলা মাফও করে দিবেন। সাথে সাথে এভাবে প্রতিদিন আরো আমল করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

এতে আরেকটি ফায়দা হলো, যেসব গুনাহের ব্যাপারে আপনি তাওবা করেছেন দ্বিতীয় দিন তা করতে আপনার মন সায় দিবে না। কারণ, তাওবা করার পর উক্ত গুনাহর প্রতি একটা ঘৃণাভাব সৃষ্টি হয়। এভাবে আপনার দুনিয়া ও আখিরাত সবই উন্নত হবে ইনশাআল্লাহ।

৮. মুজাহিদীনে কিরামের উচিত জিহাদের পথে স্থির থাক এবং গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন ১০০ বার এই দুআটি পড়বে-

ياحى برحمتك استغيث لااله الاانت سبحانك انى كنت من الظالمين

দুশমনদের দুশমনী থেকে এবং বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মাগরিবের নামাযের পর ৪১ বার সূরা কুরাইশ এবং আসরের পর ৩০০ বার এই দুআ পড়বে—

الهم انا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم

ফজর ও মাগরিবের পর তিনবার এই দুআ পড়বে—

(١) اعوذ بكلمات التامت من شر ماخلق

(٢) بسم الله الذى لايضر مع اسمه شيئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم

(٣) الهم انى اسئلك القافية فى الدنيا والاخرة الهم انى اسئلك العفو والعافية فى دينى ودنياى واهلى ومالى الهم الستر عودرنى وامن روعتى الهم احفظى من بين يدى ومن خلفى و عن يميتنى وعن شمالى ومن قرقى واعوذ بعظمتك انا اغتال من تحتى

৯. প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ইস্তেখারা করে নিবে। এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাআলার কাছে মঙ্গল কামনা করা। কেননা মানুষের বুদ্ধিও যেমন সীমিত ইলমও কম। এমনিভাবে সে কখনো বিবেকতাড়িত হয়ে বিপথেও চলে যেতে পারে, পরাজিত হতে পারে আবেগের কাছে। এ জন্য সে নিজেই নিজের মঙ্গলের ফায়সালা করতে পারে না। এজন্য ইস্তেখারা করা তার জন্য জরুরী।

একথাটা একেবারে বাস্তব যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে ইস্তেখারা করে এবং আল্লাহর নেক বান্দাহদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করে সে কখনো

পস্তায় না। তার কাজে মঙ্গলই হয়। সাথে সাথে তার সকল বিপদ-আপদও মঙ্গল ও বরকতের সুসংবাদ বয়ে আনে। নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন–

من سفادة المرء استخارة ربا ورضاه بماقضى وشفاء المرء لركه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضا-(تخارى)

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি বড়ই ভাগ্যবান, যে তার রবের সাথে ইস্তেখারা করে এবং তাঁর ফয়সালার উপর রাজী থাকে। আর সে ব্যক্তি বড়ই দুর্ভাগ্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইস্তেখারা করে না এবং তাঁর ফয়সালার উপরও রাজী থাকে না।

ইস্তেখারার মাধ্যমে স্বপ্নে কোন কিছু দেখার বিষয়টির বিষয়ে কথা হলো যদি তা সম্ভব হয় হলো, অন্যথায় এটা জরুরী নয়। আসল কথা হলো, যখন কোন মানুষ কোন কাজের শুরুতে ইস্তেখারা করে এবং যদি তার সে কাজের মধ্যে মঙ্গল থাকে, তাহলে এমনিতেই সে কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে এবং তার মনও সেদিকে ধাবিত হবে আর যদি তার মধ্যে মঙ্গল না থাকে, তাহলে সেই স্থানের মধ্যে প্রতিকলুতা সৃষ্টি হবে এবং তা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, এমনকি মনও সেদিকে ধাবিত হবে না।

১০. বেশি বেশি দরুদ শরীফ পাঠে অনেক ফযীলত রয়েছে। এটা সৌভাগ্যেরও বিষয় বটে। বেশি পরিমাণে দরূদ পড়লে বালা-মুসীবত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। উপরন্তু হুযূর (সা.)-কে মহব্বত করা ঈমানের অংশ। আর মহব্বতের চাহিদা হলো, প্রিয় নবী (সা.)-এর উপর বেশি বেশি দরূদ পড়া। এটা এমন একটি আমল যা সর্বাবস্থায় কবুল হয়। আর দরূদ পাঠকারী দুনিয়াবী ও উখরুরী বিভিন্ন রকমের নেয়ামত প্রাপ্ত হয়। এসব নেয়ামতের মধ্যে সবচে বড় নেয়ামত হলো- আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ১০টি করে রহমত, যা প্রত্যেকবার দরূদ পাঠকারীর উপর নাযিল হয়। আর দ্বিতীয় বড় নেয়ামত হলো, রাসূলে করীম (সা.)-এর নৈকট্য-হাদীসে বর্ণিত আছে। নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আমার অধিক নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে আমার প্রতি বেশি দরূদ পাঠ করে। -তিরমিযী

আমাদের আকাবির পীর-মাশায়িখ ও মুজাহিদীনে কিরামের অধিক দরূদ পাঠের অভ্যাস সব সময়ই ছিলো। এজন্য মুজাহিদীনে কিরামের উচিত অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করা। যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রত্যেহ্ ১০০০ বার এই দরূদটি পাঠ করবেন। দরূদটি হলো–

صلى الله على النبى الامى

আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে হযরত শাইখুল মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) কর্তৃক রচিত ছোট দরূদের বইটি প্রত্যেহ একবার পাঠ করবে।

হক্কানী পীরের হাত ধরুন

মুজাহিদীনে কিরামের খিদমতে আমার একটি বিনীত আবেদন হলো– নফসের ইসলাহের জন্য, ঈমানের মজবুতি লক্ষ্যে যিকরুল্লাহ ও অন্যান্য ইবাদতে পরিপক্বতা আনতে কোন হক্কাকী দীনদার, মুখলিছ দুনিয়াবিমুখ, সুন্নাতের অনুসারী আলিম ও জিহাদে মহব্বতকারী পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ করুন। এতে রূহানী ইসলাহের স্তরগুলো সহজে অতিক্রম করা যাবে। তবে খুব চিন্তা-ভাবনা করে ইসলাহও সংশোধনের নিয়তে বাইআত হতে হবে। সাথে সাথে পীরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে, তাঁকে জানাতে হবে সকল আত্মিক রোগ-ব্যাধির কথা এবং আমল করতে হবে তদনুযায়ী। অন্যথায় শুধু বাইআত হয়ে থাকলে তেমন কোন ফায়দা নেই।

পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখুন

আজকের পৃথিবী প্রচণ্ড দ্বন্দ্বমুখর। বিশেষত মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের যুগ বলে আখ্যায়িত করলে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। এই দ্বন্দ্বের কুফলের দরুন উম্মাতে মুসলিমার ঐক্য বিলীন হয়ে গেছে। আজ উম্মাহ বিভিন্ন জাতি, গোত্র, এলাকা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে টুকরা টুকরা হয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে এই মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব কমেনি, বরং তা বেড়েছে।

এই জাতীয়তাবাদ ও চরমপন্থাকে নবীজী (সা.) সমূলে খতম করেছেন এবং কুরআনে কারীমে এই জাতীয়তাবাদ ও চরমপন্থার কল্যাণকে

অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা দিয়ে 'সকল মুমিন ভাই' –এর মহান দর্শন চালু করা হয়েছে। আজকে পুরনায় মুসলমানদের মধ্যে সে নাপাক শ্লোগানই ধ্বনিত হচ্ছে এবং মুসলমানরা শারীরিক মানসিক সার্বিক দিক দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ও ভাষার মধ্যে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে।

আরেক ফিতনা শুরু হয়েও মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব। আর তা হচ্ছে, রাসূলে কারীম (সা.) হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন (রহ.) যেসব মাসায়িলের ব্যাপারে ঐকমত্য সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেসব মাসআলা নিয়ে নতুন গবেষণা শুরু করে দিয়ে শুরু হয়েছে নতুন ফিতনা ও ইখতিলাফ। সৃষ্টি হয়েছে নানা গ্রুপের। এসব গ্রুপ একে অপরকে শত্রু মনে করছে।

আরেকটি বড় ফিতনা এও শুরু হয়েছে যে, সকল গ্রুপেই যা বিদ্যমান তা হলো, "হামবড়া" ভাব। এই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের মানসিকতা বা নিজ ব্যক্তিত্ব বহু কিছু মনে করার এই রোগ অনেক কার্যকর সংগঠন ও মিশনকে ধ্বংস করে চলেছে। এই ফিতনার শিকার হয়েছে এ যাবত অনেক বড় বড় সংগঠন।

সকল দলেই গ্রুপিং লবিং এবং দলের ভিতরে ছোট দল থাকে, এটা রাজনৈতিক বা কোন দুনিয়াবী দলে থাকতে পারে কিন্তু এই সমস্যাটা যদি কোন দীনী রাজনৈতিক কিংবা অরাজনৈতিক সংগঠনে সৃষ্টি হয় তাহলে তা খুবই দুঃখজনক ও বিভ্রান্তিকর। কারণ, দীনী সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য তো কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। সেখানে এ ধরনের বিষয়ের অবতারণা সেই সন্তুষ্টিকে বাধাগ্রস্ত করবে। সাথে সাথে সেই নেতা বা কর্মীর ইখলাসকে করবে প্রশ্নবিদ্ধ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য যে, আজকে এ ধরনের ফিতনার সবচে বেশি শিকার দীনী রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগুলো। কিছু লোকের সামনে তাদের ব্যক্তিত্বটাই যেন পৃথিবীর সবচে' বড় বস্তু; সেটার কোন নজীর ও তুলনাই নেই। এই সমস্যাটাই দীনী সংগঠনগুলোকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে একদিন নিঃশেষ করে দিবে।

আর আল্লাহ্‌র রাহের মুজাহিদীনে কিরাম, খবরদার! কখনো এ ধরনের ফিতনায় পড়বে না। কখনো এ ধরনের ফিতনা নিজেদের সামনে আসতে দিবেন না। কেননা আপনাদের সফলতা। কেবল ঐক্য ও একতার মধ্যে নিহিত। খোদা নাখাস্তা আপনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, তোমাদের একে অপরের সাথে মত বিরোধ হলে তোমরা আল্লাহ্‌র নেক নজর থেকে পড়ে যাবে। দুশমনের অন্তরে তোমাদের প্রভাব ও ভীতি বাকী থাকবে না। পরাজয় তোমাদের জন্য নিশ্চিত হয়ে যাবে।

ঈমানের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীরা! শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিজকে সব সময় বাঁচিয়ে রাখো। তোমাদের জিহ্বা একে অপরের গীবত থেকে মুক্ত থাকা চাই। তোমাদের অন্তর একে অপরের ভালোবাসায় পূর্ণ থাকা চাই। যেমনিভাবে তোমাদের বাসায় পূর্ণথাকা চাই। যেমনিভাবে তোমাদের জন্য জরুরী হলো (রুহামা-উ বাইনা হুম) পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিকতা (আশিদ্দা-উ আলাল কুফফার) কাফিরদের বেলায় আপোসহীনতা ও কঠোরতা।

সেসব লোকের ব্যাপারে তোমরা খুব সাবধান থেকো, যারা তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়, যারা চায় তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ির ফিতনা ছড়িয়ে দিতে। এমন মানুষরূপী শয়তান থেকে তোমরা সতর্ক থেকো, যারা তোমাদের মুরব্বী এবং সাথীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে প্ররোচণা দেয়। মনে রেখো, আজ উম্মাহর দুর্বল অসহায় ও আশ্রয়হীন মা-বোনেরা তোমাদের পানে তাকিয়ে আছে। অশ্রুভেজা চোখ নিয়ে এবং ছেঁড়াফাটা পোশাক আছে। তোমাদের দিকে চেয়ে আছে তোমাদের অসংখ্য নির্যাতিত তরুণী বোন; তারা তোমাদের সফলতার জন্য দু'আ করছে। দুআ করছে তোমাদের জন্য বিশ্ব ব্যাপী অসংখ্য বৃদ্ধ পীর-মাশায়িখ, তোমাদের জন্য দুআয় প্রকম্পিত হয়ে উঠছে মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীসহ অসংখ্য মসজিদ ও খানকা। এমতাবস্থায় যদি তোমরা একজন আরেকজনের পিছে পড়ো, তাহলে সেটা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এমতাবস্থায় তোমাদের জন্য হারাম হবে তোমাদের পদের লোভ ও ব্যক্তিস্বার্থ।

এ অবস্থায় আপনাদের জন্য বৈধ হবে না ব্যক্তিগত হক ও স্বার্থের পিছে পড়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া। বিশ্বাস করুন, যদি চারজন মুসলিম মুজাহিদও একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদী মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আমেরিকা-ইসরাইল কেউই তাদের মিশনকে প্রতি হত করতে পারবে না। আর যদি তাদের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্য না থাকে, তাহলে তারা সংখ্যায় সহস্রাধিক হোক না কেন, তাদের মিশন সফল হওয়া মুশকিল হবে।

আজকে মুজাহিদীনে কিরামের ঐক্য, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক হৃদ্যতা খুবই জরুরী বিষয়। এমতাবস্থায় কুফরী ও বাতিল শক্তি এদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে সদা তৎপরই থাকবে। তাই অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচার নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া যেতে পারে।

১. জিহাদী সংগঠনের শূরার সদস্য, আমিলার সদস্য আপোসে কাছাকাছি অবস্থান করবে এবং সকল বিষয়ে পরামর্শ করে কাজ করবে। কারো ব্যাপারে কোন মৌলিক কোন অভিযোগ শুনবে না বরং তা লিখিত দাখিল করতে বলবে। সাথে সাথে কারো ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিবে, দেরি করবে না। এতে তাড়াহুড়াও করবে না। তবে যথাসাধ্য বিষয় বেশি ছড়াবে না।

২. কোন সাথীর যতোই যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতা থাকুক না কেন সাংগঠনিক সিস্টেমের বাইরে থেকে কোন প্রকার বাড়তি সুবিধা দিবে না। এমনকি তার সাথে এজন্য কেউ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও রাখবে না।

৩. শূরা ও আমিলার সকল কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আমীরসহ সকল সদস্যের অবগত থাকতে হবে। অন্যথায় ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে।

৪. আমীরসহ সবাই নিজ নিজ হিসাব আমীর ও শূরার সামনে পেশ করবে। বিশেষ করে যখন কেউ সফর থেকে আসবে এবং যখন নতুন কোন কাজ শুরু করবে।

৫. কোন সদস্য একা সফর করবে না। বরং কমপক্ষে সাথে আরেকজনকে রাখবে। এমনিভাবে কাউকে সাক্ষাৎকার দিতে হলে কিংবা

সরকারী বেসরকারী কারো সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করতে হলে অবশ্যই একজন সাথে নিবে। এ ব্যাপারে আমীর সাহেব বিশেষ নজর রাখবেন।

৬. সাধারণ সাথীদের কাছে শূরা কিংবা আমিলার কোন সাথীর দোষ বয়ান করবে না। বরং এটা শূরা এবং আমিলার মধ্যে সীমিত রাখবে।

৭. শূরা কিংবা আমিলার মিটিংয়ের পর সাধারণ সাথীদের কিংবা পরস্পর পরস্পরকে এমন কথা বলবে না যে, অমুক কাজ তো আমার কারণেই হলো। অন্যথায় মিটিংয়ে এ ব্যাপারে কেউই প্রথমে রাজী ছিলো না।

৮. পারস্পরিক নির্দেশ বা কোন সংবাদ মৌখিক পাঠাবে না। এতে কখনো বিভ্রান্তি হয়।

৯. প্রত্যেক শাখার নিয়ম-কানুন প্রত্যেক শাখার সাথীদের কাছে থাকা চাই। এতে কাজ করতে সুবিধা হয়।

১০. শূরার সিদ্ধান্তসমূহ সকল সাথী জানবে। হ্যাঁ, কোন একান্ত বিষয় থাকলে তা ভিন্ন কথা।

১১. শূরা বা আমিলার মধ্যে সবাই মিলে মশওয়ারা করবে। এমন যেন না হয় যে, দু-চার জন মিলে ভিন্ন একটি গ্রুপই সব সিদ্ধান্ত নেয়।

১২. পরস্পরের মধ্যে খুব বেশি বেশি সালামের প্রচলন করবে। অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার ক্ষতি ও খারাপী সম্পর্কে মাঝে মধ্যেই আলোচনা করবে।

১৩. সবাই সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। কেউ কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না।

১৪. একই জিম্মাদারীতে একজনকে স্থায়ীভাবে রাখবে না। এতে বিভিন্ন সমস্যা হয়।

১৫. সকল ফায়সালা শরীঅত মতো করবে। সাথে সাথে সাথীদের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখবে। শুধু কাউকে জোড়ানোর জন্য কিংবা কারো মন জয় করার জন্য গলদ পদক্ষেপ নিবে না।

১৬. নেতৃস্থানীয়সহ সকল সাথীর মধ্যে এলাকা ভাগ তথা বর্ণভেদের বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি করবে। সাথে সব এলাকার এবং সব ভাষাভাষির মানুষের এক সাথে কাজ করার পরিবেশও সৃষ্টি করবে।

১৭. সবাই এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে যাতে তোহমত তথা অপবাদ আসার আশংকা না থাকে। বিশেষ করে নেতৃস্থানীয়রা এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে।

১৮. মশওয়ারা করে আমীর নির্ধারণ করবে। সাথে সাথে মশওয়ারা দানকারীদের দস্তখতও নিয়ে রাখবে, যাতে পরবর্তীতে এই আমীরের ব্যাপারে ফিতনা না করতে পারে।

১৯. সাংগঠনিক সকল কাজের মধ্যে এবং ফায়সালার মধ্যে ইনসাফ করবে। ইনসাফের ব্যাপারে কারো প্রতি দয়া দেখাবে না বা ছাড় দিবে না।

আমীরের আনুগত্য

আমীরের আনুগত্য একজন মুজাহিদের জন্য অতীব জরুরী, সাথে সাথে তা তার সফলতার গ্যারান্টিও বটে। আর আমীরের অবাধ্যতা একজন মুজাহিদের জন্য ব্যর্থতা এবং একটি ধ্বংসাত্মক গর্তের মতো। এ গর্তে পড়ার পর তা থেকে উঠে আসা খুবই মুশকিল, চাই সে নেতৃস্থানীয় হোক আর সাধারণ কর্মী হোক। হ্যাঁ, খালিস দিলে তাওবা করার পর পূর্ণভাবে আমীরের আনুগত্যের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তার ব্যাপারে আশা করা যায় যে, হিদায়াত পাবে। তবে বিষয়টি সহজ নয়।

যতোক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যের প্রতি যত্নবান থাকে, ততোক্ষণ আসমানী সাহায্য ও যমিনী সফলতা তার অনুকূলে থাকে এবং সে এমন উচ্চস্থানে পৌঁছে যায় যে ব্যাপারে তার কোন ধারণাও ছিলো না। কিন্তু যখনই আমীরের আনুগত্যের জয্বা কমতে থাকে তখনই শুরু হয়ে যায় তার অধঃপতনের যাত্রা।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহান নির্দেশাবলীতে আমীরের আনুগত্যের প্রতি খুব জোর দেয়া হয়েছে। এমনকি নবীজী (সা.) আমীরের আনুগত্যকে খোদ তাঁরই আনুগত্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি মুখলিস আমীরের মঙ্গল কামনাকারী এবং দলবদ্ধ জীবন-যাপনকারী (মুসলমানকে) মুনাফিকী থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

সুতরাং আল্লাহ্র যমিনে আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ মেহনতকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই আমীরের আনুগত্যে একশ'ভাগ কৃতকার্য হতে হবে। অন্যথায় তার প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে।

যেহেতু আমীরের আনুগত্য করা না করার উপর একটি আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতার ভিত্তি, এজন্য আমীর নির্বাচনের বেলায়ও খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে এমন না হয় যে, যাতে লোকেরা শরয়ী কারণেই মানতে রাজী হবে না। আমীর হবেন ইলমী, আমলী এবং শারীরিকভাবে আমীর হওয়ার যোগ্য। সাথে সাথে এমন ব্যক্তিকে আমীর বানাতে হবে, যিনি এই দায়িত্বের চাপ বহন করতে পারবে এবং যে আমীর হওয়ার প্রত্যাশীও নয়।

যখন কোন ব্যক্তি আমীর নির্ধারিত হবেন তখন তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মানতে হবে, যতোক্ষণ তিনি শরীআতের খেলাফ কোন নির্দেশ না দিবেন। তিনি যদি কখনো শরীআত পরিপন্থী কোন নির্দেশ দিয়ে দেন তাহলে তার সেই আদেশ মানা যাবে না।

মুজাহিদের আয়না

নীচে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন করছি, প্রত্যেক মুজাহিদ এসব প্রশ্নের ভিত্তিতে নিজকে প্রশ্ন করুন এবং চিন্তা করুন ও এসবের জবাব খুজুন। আর দেখুন এসবের কোনটি নিজের মধ্যে আছে কোনটি নেই। থাকলে আল্লাহ্র শোকরিয়া করুন।

(১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এর উপর, আখিরাতের উপর, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার উপর, সকল নবীদের উপর, সমস্ত ফিরিশতাদের উপর, তাকদীরের উপর কি আমার ঈমান একেবারে পরিপক্ব? এসব বস্তু কি আমি অন্তর থেকে মানি?

(২) আমার মনে পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দের আগ্রহ বেশি নাকি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়ার তামান্না বেশি?

(৩) জিহাদ কি ফরয? ফরয তো বটেই; আমি এ রাস্তার জন্য এ যাবত কতোটুকু কি করেছি?

(৪) আমি কি পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদের সাথে নাজেরা পড়েছি? আমার নামায পড়ার পদ্ধতিটি কাউকে দেখিয়ে দুরস্ত করেছি?

(৫) আমার কি ইসলামী ফরযসমূহ হালাল-হারাম ও জরুরী বিধানাবলীর ইল্‌ম আছে?

(৬) আমি কি তরবিয়াত গ্রহণ করেছি?

(৭) আমার জীবন কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ মুতাবিক পরিচালিত হচ্ছে? নাকি এতে কোন প্রকার ত্রুটি রয়েছে?

(৮) আমি আমীরের আনুগত্য করতে কতোটুকু আগ্রহ রাখি?

(৯) আমার উম্মাহর সেসব বিষয় জানা রয়েছে, যদ্দরুন উম্মাহ আজ করুণ পরিণতির শিকার? উম্মাহর সমস্যা সমাধানে আমি ব্যক্তিগতভাবে কি পদক্ষেপ নিয়েছি?

(১০) ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর খিদমতে আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ কি?

প্রত্যেক মুজাহিদ নিজকে এসব প্রশ্ন করুন এবং নিজের কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর চান; সমুহ উন্নতি ও তরক্কীর জন্য নিজকে মানসিক, দৈহিক ও শারীরিক সার্বিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করুন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন আমীন, সুম্মা আমীন।

সমাপ্ত

মুজাহিদের পথ ও পাথেয়

৯ নং ঢালকানগর লেন, ফরিদাবাদ, ঢাকা